অদ্রীশ বর্ধন

হাঙরের কান্না

হাড়-কাঁপানো সায়েন্স ফিকসন

হাঙরের কান্না

অদ্রীশ বর্ধন

পত্রলেখা—৯।৩, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

সূচী

হাঙরের কান্না

সুজিত ভাবতে পারেনি এমন একটা নির্জন জায়গা পাওয়া যাবে এ তল্লাটে। পূজোর ছুটিতে এসেছিল দিদির বাড়ী। পাহাড় আর জঙ্গল ওকে চিরকাল টানে। কলকাতায় যার জন্ম, শিক্ষা—বনজঙ্গল পাহাড়ের দিকে তার আকর্ষণ থাকবেই। সুজিতের ছিল একটু বেশী রকমের।

বেশ জায়গা। চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়। ঘন সবুজ প্রায় কালচে জঙ্গল উপত্যকার ওপর দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠে গেছে। ও জঙ্গলে নাকি নেকড়ে আছে। ছোট নেকড়ে। এক-একটা দলে পাঁচ-সাতটা থাকে। মানুষ দেখলে এড়িয়ে যায়। খরগোশ, হরিণ—এই সব খায়।

জামাইবাবু ফরেস্ট-অফিসার বলেই নেকড়েদের এত খবর রাখেন। নেকড়েরা নাকি নরাধম নয়। নর-রক্তপিয়াসী নয়। বরং মানুষ দেখলেই গা ঢাকা দেয়—রাইফেলের রেঞ্জের দূরে দূরে থাকে। এক-একটা নেকড়েকে ট্র্যানকুইলাইজার দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গলায় রেডিও-ট্রান্সমিটার লাগানো বেল্ট পরিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিতেন জামাইবাবু। তারপর রেডিও-সিগন্যাল ফলো করে নেকড়েদের সম্বন্ধে এত খবর জোগাড় করেছেন যে একখানা বই লেখা যায়।

নেকড়েরা মানুষদের চাইতেও বিয়ে থা'র ব্যাপারে দারুণ সেন্টিমেণ্টাল। নেকড়েদের সর্দার দলের সবার ভাল দেখতে গিয়ে বহুক্ষেত্রে নিজে বিয়ে করে না—দলের সুন্দরীদের দিকে ফিরেও চায় না।

সুজিত এ সব গল্প হাঁ করে শুনত। জামইবাবু ফরেস্ট-অফিসার হলেও নেহাৎ জংলী নন। জঙ্গলে জঙ্গলে রাইফেল কাঁধে ঘোরেন, বাকী সময়টা কলকাতা বোম্বাই থেকে মোটা মোটা বই ভি-পি-পি করে আনিয়ে রাত জেগে পড়েন। আচ্ছা বই-পাগল মানুষ। জেনেটিক্স

ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে ইদানীং খুব পড়াশুনা করছেন। নেকড়েদের এত গুণ দেখে বলছিলেন, হাজার হাজার বছর আগে এই নেকড়েদের ধরে আদি কুকুরদের সঙ্গে মিলিয়ে মানুষ এ-কালের কুকুর সৃষ্টি করেছে। সাড়ে তিন কোটি বছর আগে কুকুরদের পূর্বপুরুষ (সাইনোডিকটিস) গাছে থাকত। এস্কিমোদের স্লেজ-কুকুর হাস্কি-রা নাকি আজও নেকড়ে নইলে বিয়ে করে না—রক্তের টান যাবে কোথায়!

জামাইবাবু বলতেন, সুজিত, আমি যদি বৈজ্ঞানিক হতাম, তাহলে নেকড়েদের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেখতাম কি দাঁড়ায়!

সুজিতের দিদি মুখ টিপে হেসে বলত, সেটা তো আমি রোজই দেখছি। এই চার বছরেই হাড় ভাজা-ভাজা করে ছাড়লে।

হা হা করে হেসে উঠতেন জামাইবাবু।

এই হল দিদি জামাইবাবু। বেশ আছে দুটিতে। জঙ্গলের মধ্যে মানুষ বলতে দূরে দূরে কিছু জংলী। সভ্য মানুষের চাইতেও তারা অনেক সভ্য মনের দিক দিয়ে। আর আছে জঙ্গলের সাপখোপ। মানুষ-সাপের চাইতেও তারা নিরাপদ। ল্যাজে, পা না দিলে ছোবল মারে না—দেখলেই দূরে সরে যায়। মানুষ তো সামান্য স্বার্থের জন্যে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করে না। জঙ্গলের বিশুদ্ধ হাওয়ায় তাই দিদি-জামাইবাবুও বিশুদ্ধ থাকতে পেরেছে।

সুজিত এসে পড়ল দুজনের মাঝে। দুদিনেই ভুলে গেল কলকাতাকে। মনে হল যেন এই জঙ্গল তার বাড়ী, এই পাহাড় তার বেড়ানোর জায়গা, এই নেকড়ে, সাপ আর সব শ্বাপদরা তারব ন্ধু। জঙ্গলের এমনই মহিমা। নিজের করে নেয় পরকেও।

একদিন সকালবেলা চা খেতে খেতে জামাইবাবু বললেন, "সুজিত, খবর আছে।" জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় সুজিত। আড়চোখে তাকায় দিদিও।

"পরশু এক ব্যাটা নেকড়েকে পাকড়াও করেছিলাম।"

"বউটার লোভে বোধহয়?" বাঁকা সুরে বলল দিদি।

"বউ থাকলে তো। ব্যাটা দল-ছুট। দল থেকে কেটে পড়েছে, কি ভাগিয়ে দিয়েছে—যা হয় একটা কিছু হয়েছে। এরা আবার মনের মত জায়গা না পেলে বিয়ে করে না, নিজের দল নিজে বানায় না—দলে থাকলে যদ্দিন বাঁচতো তদ্দিন বাঁচেও না। এমন জায়গা খোঁজে, যেখানে অন্য নেকড়ে যায় না।"

"তুমি তো সব জায়গায় যাও, কাজেই বেচারা কোথায় আর জায়গা পাবে বলো।"

চোখ টিপে জামাইবাবু বললেন, "এমনও তো হতে পারে, তোমার কাছেই এসেছিল দল বাঁধবে বলে।"

"মন্দ হত না," দিদিও কম যায় না "তোমার দৌড়টা যাচাই করে নেওয়া যেত।"

"হাঃ হাঃ হাঃ! তা মন্দ বলোনি। যাই হোক, ব্যাটাকে ট্র্যানকুইলাইজার বুলেট দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে পাকড়াও করলাম। তারপর গলায় রেডিও কলার পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছি আজ ভোর রাতে।"

"ছেড়ে দিলেন?" সুজিত সোজা হয়ে বসল।

"সাধারণতঃ দল-ছুট নেকড়ে দলের চারপাশেই বেশ কয়েক মাইল দূরে দূরে ঘুরতে থাকে। আমি এর সিগন্যাল ফলো করে সেই দলটার সন্ধান করে তোমাকে দেখাবো নেকড়ে-বউরা স্বামীদের কত তোয়াজ করে।"

বলে ফের সেই দিল খোলা প্রাণঢালা হা-হা হাসি।

"মরণ আর কি!" বলে উঠে গেল দিদি। যেতে যেতে বলে গেল—"এত করেও মন ওঠে না। ভেবেছিলাম আজ কান্ রুটি আর মুরগীর দো-পেঁয়াজা করব। সব বন্ধ।"

"রান্নাঘর লক-আউট!" পেছনে থেকে হেঁকে উঠলেন জামাইবাবু—"মালিকের জুলুম চলবে না, চলবে না। হাঃ হাঃ হাঃ!"

হাসি থামল। পেয়ালা ঠন্ করে নেমে এল পিরিচে। জামাইবাবু উঠে পড়ে বললেন "চলো।"

"কোথায় ?"

"নেকড়েটার পেছনে।"

"সিগন্যাল ফলো করে ?"

"ইয়েস, মাই বয়।"

তাই এই নির্জন জায়গায় এসে পড়েছে সুজিত। ঘন জঙ্গল। রোদ্দুর পর্যন্ত মাটি ছুঁচ্ছে না—মগডালের চাঁদোয়ায় লেগে ঠিকরে যাচ্ছে। পাতার জালের মধ্য দিয়ে আসা আলোর আলপনা আঁকা বনতল মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে জামাইবাবুর পেছনে পেছনে। দুজনেরই পায়ে হান্টিং-বুট, কাঁধে রাইফেল। সুজিত এই বিদ্যেটি কলকাতায় থাকতেই রপ্ত করেছে। পুরুষমানুষ যদি ঘোড়ায় না চড়ে আর রাইফেল না চালায় তাহলে তাকে পুরুষ বলা যায় না—এই হল ওর থিওরী। আর এই আদর্শটা আছে বলেই জামাইবাবুকে পূজো করে মনে মনে। কলকাতায় ছায়া-দেখে চমকে-ওঠা হাড়-জিড়জিড়ে ভীতু লোকগুলো এসে দেখে যাক পুরুষমানুষ কাকে বলে। বিয়ের সময়ে যতটা বিরাট ছিলেন জামাইবাবু, জঙ্গলের হাওয়ায় যেন তার দুগুণ হয়ে গেছেন। সাহসটাও সেই অনুপাতে বেড়েছে। নইলে বুনো নেকড়ের পেছনে পেছনে জঙ্গল ঘুরে বেড়ান !

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন জামাইবাবু। এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, "এদিকে তো কখনো আসিনি।"

পাশে এসে দাঁড়াল সুজিত। ওরা দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় রকমের পুকুরের পাড়ে—চারদিকের বড় বড় গাছগুলো ডালপালা নামিয়ে দিয়েছে জলের দিকে। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে পুকুরের জলে। জল নিথর। বাতাস নিথর। গাছপালা পর্যন্ত। কোথাও কোনো পাখীর আলাপন নেই, বাতাসের কানাকানি নেই, পাতার সরসরানি নেই, বনের জীবদের বেঁচে থাকার চিহ্ন নেই। নিস্তব্ধ নিস্পন্দ নিথর।

তা সত্ত্বেও, এত অদ্ভুত নীরবতার মধ্যেও সুজিতের মনে হল কারা

যেন ওদের দিকে ঠায় চেয়ে আছে। ওরা ছাড়াও কারা যেন রয়েছে এখানে—চোখ রয়েছে ওদের ওপর।

অজান্তে রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল সুজিত।

ফিরে দেখলেন জামাইবাবু। মুখ গম্ভীর। কাঁধে ঝোলানো রেডিওতে ক্ষীণ বীপ বীপ···শব্দটা কেবল শোনা যাচ্ছে। দল-ছুট নেকড়েটা এদিকেই এসেছে।

কাঁধের রাইফেলে জামাইবাবু কিন্তু হাত দিলেন না। সুজিত জানে দরকার পড়লে বিদ্যুৎ যে বেগে যায়, তার চাইতেও বেশী বেগে কাঁধের রাইফেল নামিয়ে, টিপ করে, গুলি করতে পারেন জামাইবাবু এবং সেগুলি কখনো ফসকায় না।

সুজিতের দিকে ফিরে তাকিয়ে ওর রাইফেল বাগিয়ে ধরা দেখেই ফিক করে হেসে বললেন,—"ভয় করছে?"

সুজিত কথা বলল না। জায়গাটা এত নিস্তব্ধ যে কথা বললেও যেন একটা অন্যায় করে ফেলা হবে। যেন এ জায়গায় কেউ চেঁচায় না, আওয়াজ করে না, বনমর্মর জাগে না, কাকলী শোনা যায় না—মৃতুপুরীর মতই স্তব্ধ এই বনস্থলী—তবুও যেন মৃতের রাজত্ব নয়।

কেননা ওদের যে কেউ বা কারা দেখছে এটা যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে জামইবাবুও টের পেয়েছেন। বনে-বাদাড়ে ঘুরলে এ ধরনের জান্তব অনুভূতি জাগে—জংলীদের মধ্যে বেশী মাত্রায় দেখা যায়। কেউ বলে এনিম্যাল সেন্স, কেউ বলে এক্সট্রা-সেনসরি-পারসেপসন অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়-অতি-অনুভূতিবোধ।

পুকুরের ওপারে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন জামাইবাবু, "নেকড়ে ব্যাটাচ্ছেলে এদিকেই ঘুর ঘুর করছে। চল তো দেখে আসি।"

জীবনে এই প্রথম একটা রোমাঞ্চ, একটা নামহীন ভয় অণুতে পরমাণুতে অনুভব করল সুজিত। ইচ্ছে হল বলে, "কি দরকার জামাইবাবু? চলুন ফিরে যাই।" কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না—

এ জায়গায় কথা বলা নিষেধ বলেই।

পুকুরের পাড় বরাবর এগিয়ে চললেন জামাইবাবু। অসহ্য নীরবতার মধ্যে সেই ভাবনাটা কিন্তু কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না সুজিত। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, কেউ বা কারা যেন আড়াল থেকে দেখছে ওদের। আশে পাশে অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না—গাছের ওপরে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয় মনের ভুল। মনকে শক্ত করল সুজিত।

পুকুরের এ-পাড়ে আসতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ঘাস তুমড়ে যাওয়া একটা পায়ে চলা রাস্তা চোখে পড়ল। পাশের ঘাসগুলো তাজা মাথা উঁচু করে রয়েছে। কিন্তু সরু রেখা বরাবর বেশ কিছু ঘাসের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে—তুমড়ে মুচড়ে মাটিতে প্রায় মিশে গিয়েছে। নিশ্চয় কেউ যাতায়াত করে এখান দিয়ে।

কে সে? যে আড়াল থেকে দেখছে?

জামাইবাবু সতর্ক চোখে পায়ের তলার ঘাস দেখছেন, সামনে পাশে পেছনেও নজর রাখছেন। বড় হুঁশিয়ার আদমী। জঙ্গলের নিয়ম গুলে খেয়েছেন।

সামনের বড় বড় গাছগুলোর তলা দিয়ে তুমড়োনো ঘাসের রেখা এগিয়ে গিয়েছে আরও গভীর জঙ্গলে। কাঁধে ঝোলানো রেডিওতে বীপ বীপ শব্দটা একটু একটু করে জোর হচ্ছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন জামাইবাবু। দৃষ্টি অনুসরণ করে সুজিত দেখল, বাঁ পাশে একটা বিরাট অজগর সাপের মত শেকড় আর ঝুরি প্রায় ঢেকে ফেলেছে একটা দানব মূর্তিকে। প্রকাণ্ড মূর্তি। কালো পাথরে খোদাই করা। একসময়ে সিধে ছিল। এখন চিৎ হয়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে। কম করেও প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা হবে মুখখানা। বিরাট বিকট সেই মুখের ওপর দিয়ে বেড়ে উঠেছে দুর্ধর্ষ বট—শেকড় দিয়ে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে মাটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে দানব মুখকে—যেন আর উঠতে দেবে না মাটির শয্যা ছেড়ে। দানবিক চোখ, নাক, ঠোঁট,

কপালের ওপর দিয়ে মোটা মোটা শেকড়গুলোর আসা যাওয়া দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুজিত। কত বছর লেগেছে এইভাবে শেকড় চালিয়ে দানবমুখকে বাঁধতে, ভাবতে চেষ্টা করল মনে মনে।

জামাইবাবু পাশ থেকে বললেন "সামনেই আরো ধ্বংসস্তূপ আছে মনে হচ্ছে।"

নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিল সুজিত।

এগোলেন জামাইবাবু। সত্যিই পথের আশে পাশে আরো ভাঙাচোরা থাম, মূর্তি, থিলেন, তোরণ পড়ে থাকতে দেখা গেল। জঙ্গল সব কিছুই ঢেকে ফেলেছে। যেন একটা বিরাট প্রাসাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে চারিদিকে। জঙ্গল মহাউল্লাসে তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়েছে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর।

আচমকা জঙ্গলের নিরেট দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল সুবিশাল সেই প্রাসাদের কিছুটা অংশ।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন জামাইবাবুর। চোখ মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এদিকে কখনো আসেন নি জঙ্গলের মধ্যে এতবড় ধ্বংসস্তূপ দেখবার আশাও করেন নি।

কয়েক বিঘে জায়গা নিয়ে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা মস্ত প্রাসাদের মাঝের অংশটা এখনো আস্ত রয়েছে আধুনিক মিস্ত্রীর হাতের কারসাজিতে। ওরা এগোলো সেই দিকেই। পাঁচিল ভেঙে জঙ্গলের তলায় চালান হয়ে গিয়েছে, তোরণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, এক জায়গায় একটা কাঠের পোল কিন্তু নতুন করে তৈরী হয়েছে। পোলের তলা দিয়ে জলভরা পরিখা ছিল একসময়ে, এখন রাবিশ আর জঙ্গলে ভরাট হয়ে এসেছে। এই পোলটা পেরিয়ে একটা চৌকো চত্বরের মাঝে এসে পড়ল। চত্বরের উল্টো দিকে একটা দোতলা সমান প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি স্নিগ্ধ চোখে যেন অভয় দিচ্ছি সুজিতদের। বুদ্ধমূর্তির তলা দিয়ে ঘাস-মাড়ানো পথটা এগিয়ে গিয়েছে মেরামত করা প্রাসাদ অংশের দিকে। ওরা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল বুদ্ধমূর্তির তলায়, ঠিক

সেই সময়ে খুব কাছ থেকে শোনা গেল নেকড়ের হাউলিং।

করুণ কান্নার মত টেনে টেনে অদ্ভুত রক্ত-জমানো সুরে কোরাস গলায় ডেকে উঠল একপাল নেকড়ে। চক্ষের নিমেষে জামাইবাবুর কাঁধের রাইফেল নেমে এল হাতে। হাতে পায়ে চোখের চাহনিতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বোঁ করে রাইফেল হাতে এক পাক ঘুরে নিয়ে দেখে নিলেন চার দিকে।

কেউ কোথাও নেই। কিন্তু খুব কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে নেকড়ের হাউলিং—নিস্তব্ধ বনভূমি যেন শিউরে শিউরে উঠছে সেই ডাকে।

আচমকা পায়ের তলায় মাটি সরে গেল। হুড়মুড় করে সুজিত আর জামাইবাবু তলিয়ে গেল পাতালে। মাথায় একটা প্রচণ্ড চোট লাগল তখনি। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরল চোখের ওপর জোরালো আলো লাগায়। চোখের কয়েক ফুট দূরেই যেন সূর্য জ্বলছে। চোখ খুলেই তাই চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল সুজিত।

এমন সময়ে পাশ থেকে চাপা তীক্ষ্ণ গলায় ভেসে এল জামাইবাবুর ডাক—"সুজিত।"

সে ডাক স্বাভাবিক নয়। ভয়, উত্তেজনা আর রাগে থরথর করছে যেন। চোখ খুলেই ফের বন্ধ করে ফেলে ধড়মড়িয়ে উঠতে গিয়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সুজিত। এক চুলও নড়তে পারল না চিৎ-শয্যা থেকে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত কিসের বাঁধনে সে বাঁধা পড়েছে। মানুষের মন এমনই বিচিত্র যে ঠিক এই সময়ে মনে পড়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে দেখে আসা বিরাট বটের শেকড়ের তলায় আকাশ-মুখো দানব-দেহের মূর্তিখানা। তাকেও কি বট শেকড় চালিয়ে বেঁধে ফেলেছে ভূমিশয্যায়? তাহলে কি রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মত সে ঘুমিয়েছিল যুগ যুগ?

পরমুহূর্তে ফালতু চিন্তা ছুটে গেল পৈশাচিক অট্টহাসিতে। কানের

গোড়ায় কে যেন হেসে উঠল খ্যান খ্যান কাঁসি বাজানোর মত বিচ্ছিরি গলায়।

"হাঃ, হাঃ, হাঃ ! ছোকরার নাম তাহলে সুজিত ! গুড,ভেরী গুড ! এবার বলো তো বাপু, তোমার নামটা কি ?"

সুজিত কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। চোখ খুলতে পারছে না—চোখের ওপর জোরালো আলো থাকায়। মাথাও ঘোরাছে পারতে না। কপালের ওপর দিয়ে বেড়ের মত একটা বস্তু দিয়ে মেঝের সঙ্গে মাথা বেঁধে রাখায়। শুয়ে শুয়েই অনুভব করল, ও শুয়ে আছে একটা টেবিলের ওপর। অতি কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে চোখ পিট পিট করে দেখলে মাথার ওপর জ্বলছে সূর্যের মতই একটা অত্যন্ত জোরালো আলো—আলোর রঙটা কিন্তু হলুদ।

ঘাড়টা একটু ফেরাতে পেরেছিল বলেই দেখতে পেল একটু তফাতে চিড়িয়াখানার খাঁচার মত গরাদ দেওয়া একটা খাঁচার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ওর জামাইবাবুর। মাথায় মুখে রক্ত মাখামাখি। দু'চোখ যেন জ্বলছে।

আর চোখে পড়ল একটা বুড়োকে। চুল টুল সব পেকে গেছে। ভুরু সাদা। একমুখ দাড়ি, আর গোঁফ পর্যন্ত সাদা। বয়েসের ভারে একটু কুঁজো হয়ে পড়েছে।

হলুদ আলোয় দু-টুকরো হলুদ-মণির মত জ্বলছে বুড়োর হলদেটে চোখ দুটো। মুখখানা বিকৃত হয়ে গেছে বিকট উল্লাসে। পাগল নাকি !

খাঁচায় বন্দী জামাইবাবুর দিকে তাকিয়ে আবার গায়ের রক্ত জল করা হাসি হেসে বিকট বুড়ো বললেন,—"মরতে এসেছিস যখন আমার ডেরায়, তখন তোদের উচিত শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব এবার। আগে সুজিতের পালা, তারপর তোর হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !"

"কে তুমি ? বেশ তো বাংলা বলছো দেখছি ?" দাঁত কিড়মিড় করে বললেন জামাইবাবু।

"আমি ? আমার নাম আমি নিজেই ভুলে গেছি। মা বাঙালি

বাংলাটা বলে এখনো ভুলিনি ছিল। হাঃ! হাঃ! হাঃ! এই বনেই কাটিয়ে দিলাম কত বছর। সাধনা তো বনে-বাদাড়েই করে—দেখছিস না আমার চেহারাটা! ঠিক সন্ন্যেসীর মত। হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

নির্ঘাৎ পাগল! উঠতে চেষ্টা করল সুজিত। পারল না। হাত, পা, বুক, কোমর সমস্ত বেল্ট দিয়ে বাঁধা। ফ্রাঙ্কেসটাইন ফিল্মে দানবটাকে ডক্টর ফ্রাঙ্কেন্সটাইন যেভাবে বেঁধে রেখেছিল—অনেকটা সেভাবে। মতলব কি বুড়োর? ভাঙা প্রাসাদে ঐ রকম জোর ইলেকট্রিক আলোই বা এল কোত্থেকে? আলোর রঙ ওরকম হলুদই বা কেন? খাঁচার ওদিকে আবছা আলোয় আরো খাঁচা দেখা যাচ্ছে যেন। ঘরটাও বিরাট। যেন আদি অন্ত নেই। চিড়িয়াখানায় ঢুকলে যে-রকম বোঁটকা গন্ধ পাওয়া যায়—সুজিতের নাকেও সেই গন্ধ ভেসে আসছে।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে কান পেতে কি যেন শুনল বুড়োটা। হলুদ চোখ পুরো খুলে অন্য দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখল।

বলল বিড় বিড় করে—"কাঁদিসনি খোকা, কাঁদিস নি। তোর জন্যে দু'দুটো মানুষ এনেছি। তাজা মোটা মানুষ। অনেকদিন খেয়ে বাঁচবি।"

গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল সুজিতের। বুড়ো যেদিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল, সেইদিকে অতি কষ্টে ঘাড়টা কোনমতে ফিরিয়ে দেখতে পেল, প্রকাণ্ড চৌবাচ্ছার মত কি যেন একটা রয়েছে। হলুদ আলোর আভায় স্পষ্ট দেখা না গেলেও আন্দাজে মনে হল যেন একটা বিশাল অ্যাকুয়ারিয়াম। কাঁচের চৌবাচ্চা, মেঝে থেকে ঘরের প্রায় কড়িকাঠ পর্যন্ত উঁচু। লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট তো বটেই, জলভর্তি দানবিক জলাধারে শরীরী প্রেতের মত কারা যেন সাঁতরে বেড়াচ্ছে।

অমন যে ডাকাবুকো জামাইবাবু, তাঁর গলাও এবার বসে গেল নিদারুণ ভয়ে। ধরা গলায় বললেন—"কে কাঁদছে?"

"আমার ছেলে।"

"কোথায় সে?"

"শুনলে কি পেত্যয় হবে? হাঃ! হাঃ! হাঃ! ঐ জলের মধ্যে।"

"জলের মধ্যে!"

"আরে হ্যাঁ, বোকাচন্দর। আমার ছেলে মানুষের পেটে জন্মালে ডাঙাতেই থাকত।"

"তবে কার পেটে জন্মেছে?"

"হাঙরের পেটে।"

"পাগল!"

"কী! কী বললি? আমি পাগল? ওরে বোকাচন্দর, ওরে গাধা, ওরে ইডিয়েট—তিন যুগ ধরে আমার সাধনা কি বৃথা গেছে মনে করেছিস! মাছের পেটে আমার বাচ্চারা পুকুরের মধ্যে থেকে তোদের চোখে চোখে রাখেনি? খুব যে তখন ভয়ে সিঁটিয়ে গেছিলি। ওরাই তো আমার গার্ড—পুকুরে থেকে পাহারা দেয়—কেউ এলেই খবর পাঠায়। তারপর তাদের আমি ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখি। হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

বদ্ধ পাগল। কোনো সন্দেহই নেই। হাঙরের পেটে মানুষের বাচ্চা আবার হয় নাকি! পুকুরের মধ্যে থেকেও নাকি মাছ-মানুষরা লুকিয়েছিল—গুলতাপ্পির আর জায়গা পায়নি। কিন্তু উন্মাদ বুড়োর খপ্পর থেকে বেরোনো যায় কি করে?

জামাইবাবুও বোধকরি মনে মনে সেই কথাই ভাবছিলেন। তাই সাত-পাঁচ কথায় ভুলিয়ে রাখলেন বুড়োকে।

বললেন—"পুকুরের মধ্যে থেকে খবর পাঠালো কি রেডিও-ট্রান্সমিটারে?"

"ইডিয়ট ড্যাম ফুল। টেলিপ্যাথির নাম শুনেছিস? আমার ব্রেন যে ওদের ব্রেনের চিন্তার ঢেউ ধরতে পারে। ঐ যেমন খোকা কাঁদছে তোরা শুনতে পাচ্ছিস? পাবি না—তোদের ঐ মোটা ব্রেনে কিসসু

ঢুকবে না—ঢুকবে কেবল এই—তিন যুগ সাধনা করে শানানো এই ব্রেনে।”

“সাধনাটা কিসের ?

“বিজ্ঞানের, বোকাচন্দর, বিজ্ঞানের। প্রজনন-বিদ্যা নিয়ে এখন তো খুব মাতামাতি চলছে সারা পৃথিবীতে। রিকমবাইন্যান্ট জীন নিয়ে কত কাণ্ডই চলেছে। ও সব আমার কাছে পুরোনো হয়ে গেছে। আমার এই ল্যাবরেটরীতেই টেস্টটিউব বেবী বানিয়েছি এক যুগ আগে এখন বানাচ্ছে ইংল্যাণ্ডের সায়ন্টিস্ট। ছোঃ! আমি এখন কোথায় এগিয়ে গিয়েছি ধারণাও করতে পারবি না। মানুষ মেয়ে বিয়ে না করেও বাচ্চার বাবা হচ্ছি। আমার বাচ্চা জন্মাচ্ছে কখনো হাঙরের পেটে, কখনো বোয়ালের পেটে, কখনো কুমীরের পেটে। কি ঠিক করেছি জানিস ? কিছু মানুষ-নেকড়ে বানাবো। একপাল নেকড়ে ধরেছি ফাঁদে ফেলে—যে ফাঁদে তোরা পড়লি বুদ্ধমূর্তির পাশের গর্তে—ঠিক ঐ ফাঁদে ওদের ফেলেছিলাম। তোর পাশের খাঁচাতেই ওরা এখন ঘুমিয়ে আছে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দরীটা সে এবার কার বউ হবে। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তোর—তোর! বিরাট চেহারা তোর! নেকড়ে-মানুষ যা জন্মাবে না···হাঃ! হাঃ! হাঃ! তারপর তোর মাংসটা খেতে দেব আমার খোকাকে!”

জামাইবাবু যেন একদম ভয় পাননি এমনি মুখের ভাব করে নির্বিকার গলায় বললেন—“টেস্টটিউব বেবী তৈরীর মেথড তো ?”

“হ্যাঁ! বিয়ে-ফিয়ে কেউ আর করবে না। টেস্টটিউবেই সব সমস্যার সমাধান ঘটবে। তাছাড়া, মানুষের মত একটা উঁচু জাতের জীবের সঙ্গে অন্য জীবদের মিলিয়ে মিশিয়ে দেখতে চাই বাচ্চাগুলো কি রকম দাঁড়ায়। বুনো-কুকুরের সঙ্গে বুনো নেকড়ের বিয়ে থা'র ফলে যে রকম আজকের ঘরোয়া কুকুরদের পেয়েছিস, ঠিক তেমনি মানুষের সঙ্গে ইতর জীবদের মিলিয়ে দেখতে চাই নতুন কিছু করতে পারি কিনা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! ভয় পাচ্ছিস ? দূর বোকা!

এক্সপেরিমেন্ট ইজ এক্সপেরিমেন্ট ! বাঁদরদের নিয়ে, গিনিপিগদের নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে না ? তেমনি তোদের নিয়েও আমি এক্সপেরিমেন্ট করব। ঐ সুজিত ছোঁড়াটা বেশ গাবাদা-গোবদা আছে। বুনো হাতীর সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে গণেশ তৈরী হয় কিনা দেখব ঐ ছোঁড়াকে দিয়েই। তাই তো ওকে শুইয়েছি সবার আগে—খোকা এত কাঁদছে—দাঁড়া, দাঁড়া, টেস্টটিউবের কাজটা সেরে নিয়েই খেতে দিচ্ছি তোকে।”

বলে, বুড়ো একটা অদ্ভুত রকমের কাঁচের ফ্লাস্ক নিয়ে এগিয়ে এল সুজিতের দিকে। বিষম ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল সুজিত—“জামাইবাবু !”

খুব শান্ত গলায় খাঁচার মধ্যে থেকে জামাইবাবু বললেন—“দূর বোকা ! এক্সপেরিমেন্ট ইজ এক্সপেরিমেন্ট। কত বড় একটা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে ভাবতে পারিস ! গণেশের বাবা হবি তুই।—কম ভাগ্যের কথা !”

বুড়ো থমকে দাঁড়াল।

বলল—“এই তো বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা ব’লছ বোকাচন্দর। এরপর নেকড়ে-বাচ্চার বাবা হবি তুই নিজেও।”

“দাঁড়াও।”

বুড়ো ফ্লাস্ক হাতে এগিয়ে আসছিল সুজিতের দিকে, জামাইবাবুর ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—“আবার কী ? খোকাটা বড্ড কাঁদছে—যা বলবি তাড়াতাড়ি বল।”

“খোকাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।”

“খোকাকে দেখবি ? আমার খোকাকে দেখবি ? দেখলে ভয় পাবি না তো ?

“না, পাবো না।”

“কিন্তু তোকে যে আমার বড্ড ভয় করছে। যা তাগড়াই চেহারা তোর—”

“হাত বেঁধে দাও।”

ভুরু কুচঁকে চেয়ে রইল বুড়ো।

তারপর হেসে বললে—"তোর মতলব বুঝেছি। পালাতে চাস? বুড়ো ভেবে আমাকে ঘায়েল করতে চাস? দাঁড়া, তোর মজা দেখাচ্ছি।"
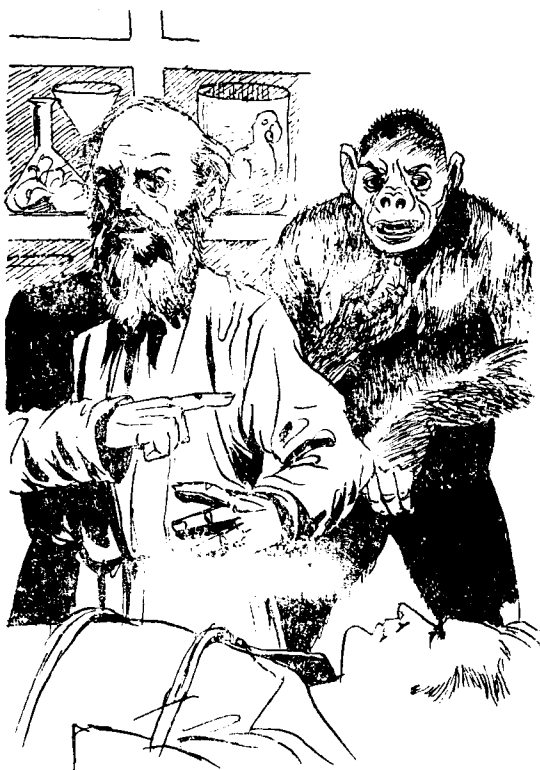
বলেই, 'টুনটুনি, এই টুনটুনি' বলে হাঁক দিলেন বুড়ো অমনি প্রায় নিঃশব্দে অন্ধকার ফুঁড়ে দু'হাত মাটিতে ঠেকিয়ে বিশালদেহী এক গরিলাসুন্দরী এসে দাঁড়াল সামনে। ছোট পা, হাত দুটো সে অনুপাতে বিরাট লম্বা। এই বুকের খাঁচা। সাংঘাতিক চেহারা। এত বড় মেয়ে-গরিলা সুজিত কখনো দেখেনি। কিন্তু সুবোধ বালিকার

মত বুড়োর সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল গোলাম হোসেনের কায়দায় 'জো হুকুম' পোজ নিয়ে।

সুজিতের চোখ তখন ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। কি করতে চায় বুড়োটা! জামাইবাবুর গায়ে যত শক্তিই থাকুক না কেন, গরিলার সঙ্গে কু করে টিঁকে থাকার শক্তি তাঁর গায়ে নেই। এখন উপায়? বুড়ো বাঁ হাতে অদ্ভুত ফ্লাস্কটা ধরে ডান হাত বাড়িয়ে গরিলার কাঁধে রাখলেন। শ্রীমতী যেন বর্তে গেল আদর স্পর্শে।

জামাইবাবুর দিকে ফিরে বুড়ো বললে—"ওরে মর্কট, ওরে বেল্লিক, ওরে ছুঁচো, ওরে গাধা! এই হল আমার ঝি, আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, আমার রাঁধুনি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কিছু করে দেয় এই গরিলা—নামটা কিন্তু টুনটুনি—ওর মিষ্টি স্বভাবের জন্যে। তবে যদি হুকুম দিই, দু'হাতে তোকে ধরে একশ'বার মাথায় ওপর পাক দিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে দু'পা ধরে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে—ঠিক যেভাবে ভীম জরাসন্ধকে চিড়ে দু'টুকরো করেছিল—সেইভাবে। দেখতে চাস?"

জামাইবাবু তখন সাধুভাষায় যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে।

খ্যান খ্যান করে আবার সেই রক্ত জল করা হাসি হেসে বুড়ো বললে—ভয়ং মা কুরু। টুনটুনি আমার বড় ভাল মেয়ে। ওর মাথায় ডলফিনের ব্রেন বসিয়ে দেওয়ার পর থেকে যুক্তি, বুদ্ধি, আই-কিউ যে-কোন মানুষের চেয়ে বেশী। জানিস তো শুধু ব্রেন বড় থাকলেই বুদ্ধি বেশী হয় না—শরীরের অনুপাতে ব্রেনের ওজন ৩·২—কিন্তু ডলফিনের শরীরের অনুপাতে ব্রেনের ওজন ৩·৭। ডলফিনরা জলে থাকে বলেই মানুষ খুব ডাঙায় তড়পে বেড়াচ্ছে। ওদের সাংঘাতিক ব্রেন নিয়ে যদি মানুষের পেছনে লাগে তো মানুষকেই জলে পালাতে হবে ডাঙা ছেড়ে। এই সব ভেবেই ঠিক করলাম গরিলার দারুণ শক্তি আর ডলফিনের বিরাট ব্রেন মিশিয়ে দেখা যাক জিনিসটা কি দাঁড়ায়!

ফলটা যে এমন হবে, ভাবতেও পারিনি। রিকমবাইন্যান্ট জীন নিয়ে এই যে বিরাট আবিষ্কার করে চলেছি, সবই টুনটুনির ব্রেনের জোরে। ওর একটা বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা আছে মানুষের সঙ্গে—সতিকারের বিয়ে। ঘর করবি ওর সঙ্গে ?

শুনেই টুনটুনি কি রকম চকচকে চোখে তাকাল জামাইবাবুর পানে। জামাইবাবুর মুখ দেখে মায়া হল সুজিতের, দিদির কথাটাও মনে হল। এই রকম সতীন দেখলে দিদি বেচারী হার্টফেল করবে নির্ঘাৎ।

বুড়ো যেন অসীম উল্লাসে ফেটে পড়ল জামাইবাবুর শুকিয়ে আমসি হয়ে যাওয়া মুখখানা দেখে।

কোমর থেকে ডান হাতে চাবি বার করে টুনটুনিকে দিয়ে বললে— "যা, তোর বরকে একটু দেখে শুনে নে—পছন্দ হলে বলবি—সাত পাক ঘুরিয়ে বিয়ে দিয়ে দেব। তারপর দেখব পৃথিবীতে অতি-মানুষ জন্মায় কি না! হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

সুজিতের অবস্থা তখন কাহিল। প্রাণপণে ছটফট করছে টেবিল থেকে ওঠবার জন্যে—পারছে না। গরিলাটাও কিরকম হাসি হাসি মুখে এগিয়ে যাচ্ছে খাঁচার দিকে হাতে চাবি নিয়ে। পেছন থেকে বুড়ো বলছে—"ভয় কি, ভয় কি, টুনটুনি বড় ভাল মেয়ে। কিছু করবে না তোকে। শুধু একটু আগলে রাখবে। সেই ফাঁকে সুজিতের সঙ্গে কাজটা শেষ করে নিই—খোকা বড্ড কাঁদছে।"

ঝন ঝনাৎ শব্দে তালা খোলার শব্দ হল। জামাইবাবু দুই চোখ বড় বড় করে পেছিয়ে গিয়ে গরাদের সঙ্গে একদম সেঁটে গেছেন। পাল্লা খুলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল টুনটুনি। দু'হাত প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল জামাইবাবুর দিকে। আর যখন মাত্র হাত তিনেক ব্যবধান দুজনের মাঝে—ঠিক তখনি বিদ্যুৎ চমকাতে যতটুকু সময় লাগে, তার চাইতেও কম সময়ের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা।

সুজিত অতিকষ্টে ঘাড় ফিরিয়েছিল বলেই দেখতে পেল, আচমকা

হেঁট হলেন জামাইবাবু, পায়ের ডিম ছুঁলেন—পরক্ষণেই হাতে দেখা গেল একটা ক্ষুদে রিভলবার। চক্ষের পলকে টুনটুনির মাথা লক্ষ্য করে পর-পর তিনবার অগ্নিবর্ষণ করল ক্ষুদে রিভলবার। থরথর করে কেঁপে উঠে সটান জামাইবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টুনটুনি—কিন্তু গরাদ ছাড়া বিরাট বুকের কজায় আর কিছুই পেল না—জামাইবাবু বাতাসের বেগে সরে গিয়ে খাঁচার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। টুনটুনি গরাদ খামচে ধরে আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ল মাটিতে—আর উঠল না।

বিকট স্বরে ককিয়ে উঠল বুড়ো—"তুই মারলি···আমার টুনটুনিকে তুই মারলি···তুই···"

খটাস্ করে রিভলবারের বাঁট দিয়ে বুড়োর মাথায় মারলেন জামাইবাবু। হাতের ফ্লাস্ক ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল মেঝের ওপর, বুড়ো লুটিয়ে পড়ল পাশেই।

লাফিয়ে এলেন জামাইবাবু। ঝটপট সুজিতের বাঁধন খুলে দিলেন। দম আটকানো গলায় সুজিত বললে—"রিভলবার পেলেন কোথায়?"

"আমার পায়ের ডিমে সবসময়ে বাঁধা থাকে—চামড়ার হাইবুটের আড়ালে। রাইফেল নিয়েছে—কিন্তু এটা নজরে পড়েনি। চল।"

"কোথায়?"

"হাঙরের বাচ্চাটাকে দেখে আসি।"

দুজনে এগিয়ে গেল বিরাট সেই অ্যাকুয়ারিয়ামের দিকে। লোহার সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর পর্যন্ত। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার দরকার হল না। কাঁচের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল কতকগুলো জীবন্ত দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

কুমীরমুখো মানুষ, বোয়ালমুখো মানুষ, হাঙরমুখো মানুষ কেউ কখনো দেখেছে? এ জিনিস কখনো সম্ভব? কিন্তু ওদের সামনেই কাঁচের গায়ে সাঁতরে বেড়াচ্ছে ভয়ংকর সেই অসভ্য প্রাণী তিনটে।

প্রত্যেকেরই কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত অবিকল মানুষের মত—মায় ছুটো পা পর্যন্ত—ওপর দিকটা কুমীরের মত, হাঙরের মত, বোয়ালের মত, এ যেন উল্টো মৎস্যকন্যা। তাদের হয় ল্যাজটা মাছের মত—ওপরটা মানুষের মত। এদের ওপর মাছ—তলাটা মানুষ।

স্বজিতদের দেখেই জলের তলা দিয়ে হেঁটে এসে কাঁচের গায়ে মুখ লাগিয়ে দাঁড়াল তিন-তিনটে শরীরী বিভীষিকা।

ফিসফিস করে স্বজিত বললে "চলুন, পালাই।"

"ভয় করছে ?"

"গা কি রকম করছে !"

"বুড়োটার একটা হিল্লে করে যাই—"

"কি করবেন ?"

"দেখবি আয়।"

জামাইবাবুর খাঁচার পাশে অনেকগুলো সারি সারি খাঁচা খালি পড়েছিল। একটা খাঁচার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সাতটা নেকড়ে।

জামাইবাবু জ্ঞানহীন বুড়োকে টেনে এনে নেকড়েদের ঘাড়ে শুইয়ে দিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিলেন বাইরে থেকে।

বললেন, "খুনে বৈজ্ঞানিকের এইরকম সাজাই হওয়া উচিত, না ?"

স্বজিত বাধা দিল না। কোন কথাও বলল না।

———

ইলেকট্রিক জীবাণু

প্রাইভেট ট্যাক্সি যখন দার্জিলিংয়ে ঢুকল, তখন রাত ন'টা। শহর অন্ধকার। দোকানপাট বন্ধ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

সুদর্শন, শিক্ষিত, নেপালী ড্রাইভার পরিষ্কার বাংলায় বললে—"টুরিস্ট-লজের পাশ দিয়ে চলে যান—মিনিট দশেকের পথ। জলা-পাহাড় যাওয়ার রাস্তায় পাবেন আপনাদের হোটেল।"

বলে, চৌমাথা থেকে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিল বেঁা করে। বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে উধাও হয়ে গেল ঝকঝকে নতুন অ্যামবাসাডর।

ছু হাতে ছুটো সুটকেশ নিয়ে গরম জামাকাপড় পরেও ভিজতে ভিজতে শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলাম আমি। নিষ্প্রদীপ, তমিস্রাময়, কুয়াশা আর বৃষ্টিতে ঢাকা এ শহরকে কে বলবে রাণী শহর।

মনটা দমে গেল খুবই! অন্ধকারে আর বৃষ্টির ধারায় বুঝতেও পারছি না কোন রাস্তাটা দিয়ে একটু উঠলে টুরিস্ট-লজের পাশ দিয়ে জলাপাহাড়ের যাওয়ার পথে পৌঁছব।

তিরিক্ষে গলায় পেছন থেকে বললেন প্রফেসার নাট-বল্টু-চক্র—"কিহে, দীননাথ! বলেছিলাম না, উড়ো খবর শুনে ছুটে এসো না—ছো! ইলেকট্রিক বিভীষিকা দেখাবে! ইলেকট্রিকই নেই গোটা টাউনে!"

কথাটা শেষ করতে পারেননি প্রফেসর।

আচমকা ডানদিকের ওপর দিকের একটা বাড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলো ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল। নিমেষের মধ্যে হাজার হাজার ওয়াট বিদ্যুৎ যেন ফেটে পড়ল ঐ পাহাড়ি কটেজে। পরক্ষণেই শোরগোল, আর্তনাদ, চিৎকার।

বিস্ফোরণের আওয়াজটা কানে ভেসে এল তারপরেই। ঘাড়

তুলে দেখলাম, অত্যুজ্জ্বল আলোক বিস্ফোরণ অন্তর্হিত হয়েছে। দার্জিলিং যেমন নিষ্প্রদীপ ছিল, তেমনই রয়েছে। শুধু যে বাড়িটায় অকস্মাৎ আলোর বন্যা বয়ে গেল, সেটা চৌচির হয়ে ওপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের রাস্তার দিকে পড়ছে!

এ সব পরিস্থিতিতে চিরকালই আমার হাতে-পায়ে ইলেকট্রিক খেলে যায়। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাজ দেয়। ধ্বসে পড়া কটেজের তলায় আমি আর প্রফেসর চাপা পড়তে চলেছি, বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সুটকেশ দুটো ফেলে দিয়ে প্রফেসরকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম এবং তীরবেগে নেমে গেলাম হিলকার্ট রোড বেয়ে নিচের দিকে।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলমে দুজনে, প্রচণ্ড শব্দে ভাঙা কটেজ এসে পড়ল সেখানে।

কোলবন্দী হয়ে হাত পা ছুঁড়ছিলেন প্রফেসর। নামিয়ে দিলাম রাস্তায়। বললাম ঠাণ্ডা গলায় "দেখতেই পেলেন, উড়ো খবর নয়। ইলেকট্রিক বিভীষিকার আবির্ভাব ঘটেছে দার্জিলিংয়ে।"

শোরগোল তখনও থামেনি। আশপাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেকেই। তাদেরই একজন শুনতে পেল আমার কথা। দাঁড়িয়েছিল পেছনেই। হাতে টর্চ। বাংলায়, বললে "ইলেকট্রিক বিভীষিকাই বটে! এত দিন হচ্ছিল নিচের ভুটিয়া গ্রামে। এই প্রথম দেখা গেল ম্যালের এত কাছে। খুব জোর বেঁচে গেলেন। কলকাতা থেকে আসছেন?"

ভিড়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "হ্যাঁ। যাবো সানগোল্ড হোটেলে। রাস্তা চিনতে পারছি না।"

ভদ্রলোক মাঝবয়সী। চোখে রিমলেশ চশমা, গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। বেশ বিদগ্ধ পুরুষ বলেই মনে হল। টর্চের আলোয় এর বেশি আর দেখা গেল না।

বললেন—"চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি। আপনাদের মালপত্র?"

"ভাঙা কটেজের তলায়।"

"চলুন তো দেখি, টেনে বার করা যায় কিনা।"

আধঘণ্টা পর সানগোল্ড হোটেলে আমাদের পৌঁছে দিলেন ভদ্রলোক। একটা সুটকেশ নিজেই বয়ে নিয়ে এলেন—আর একটাকে বইলাম আমি।

হ্যাজাক জ্বলছে ডাইনিং-হলে। দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম—"আপনি না থাকলে খুবই কষ্ট হত। আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয় নি।"

"ক্যাপ্টেনকাকা বলেই সবাই আমাকে চেনে এখানে। পার্মানেণ্ট বাসিন্দা—টুরিস্ট নই। আপনারা?

"আমাকে শুধু দীননাথ বলেই ডাকতে পারেন—কেউ চেনে না—আপনিও চিনবেন না। তবে এঁকে অনেকে চেনেন।" বললাম প্রফেসরকে দেখিয়ে।

"কে বলুন তো?"

"প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র।"

"মাই গড! আগে বলবেন তো? টেলিফোনটা আমিই তো করেছিলাম।"

"আপনি? নাম বললেন না কেন?"

রিমলেশ চশমার আড়ালে অদ্ভুত ঝিলিক দেখলাম। ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসলেন ক্যাপ্টেনকাকা।

বললেন, "এখানে যা ঘটেছে, তা অবিশ্বাস্য। তাই নাম জানিয়ে হাস্যস্পদ হতে চাইনি। তবে আপনারা এলেই আমি নিজেই যেতাম।"

"কেন?"

"কারণ," একটু থেমে আবার সেই বিচিত্র হেসে বললেন ক্যাপ্টেন কাকা—"সব কটা স্ট্রেঞ্জ কেস আমার সামনেই ঘটেছে।—আচ্ছা চলি। কাল সকালে দেখা হবে।"

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন ক্যাপ্টন কাকা। ঢালু রাস্তায় দূর থেকে

দেখতে পেলাম তাঁর টর্চের আলো ম্যালের দিকে নেমে যাচ্ছে।

কিন্তু একটা খটকা রেখে গেলেন মাথার মধ্যে।

পেছনে দাঁড়িয়ে উনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে প্রফেসরের কথাবার্তা শুনেছিলেন। উড়ো খবর নয়—এ কথাটা আমিই বলেছিলাম প্রফেসরকে। ক্যাপ্টেন কাকা অবশ্যই তা শুনেছেন।

তা সত্ত্বেও আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন কেন? নাম গোপন করে টেলিফোন তো উনিই করেছিলেন!

ব্রেকফাস্ট টেবিলে এলেন ক্যাপ্টেনকাকা।

দিনের আলোয় আরও স্পষ্টভাবে দেখলাম চেহারাটা। কি রকম যেন জেলী মাছের মতো থসথসে বপু। শীতবস্ত্র চাপিয়েও চাপা পড়ে নি। মাথায় নেপালী টুপি, কাল রাতেও দেখেছিলাম—এখনও দেখলাম। মুখখানা অদ্ভুত রকমের সাদা। সাবুর পাঁপড় ভাজা যেন, সেই রকম অজস্র সাদা আঁচিল, লাল আঁচিল। আঁচিল লাল হয় জানি, সাদা কি কখনো হয়? সন্দেহ হল, খালি গায়ে থাকলে সারা গায়েও হয়ত দেখতাম সাদা আঁচিল—ভাগ্যিস মুখখানা দাড়ি গোঁফে ঢাকা, নইলে ও মুখের দিকের তাকালে গা শিরশির করে উঠত।

প্রফেসর কিন্তু যেন বেশ মজাই পাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেনকাকার মুখশ্রী দেখে। যদিও গতকাল থেকে খেপে ছিলেন আমার ওপর, জোর করে দার্জিলিংয়ে টেনে আনায়। কিন্তু ক্যাপ্টেনকাকা চশমার কাঁচে আর সাদা দাঁতে ঝিলিক তুলে টেবিলে এসে বসতেই বেশ খুশি হয়েই উঠতে দেখা গেল বৃদ্ধকে।

স্বাগতম জানালেন উদাত্ত গলায়—"আসুন, আসুন, ওয়েট করছি আপনার জন্যেই। ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

কি ব্যাপার, তা আর ব্যাখ্যা করে না বললেও ক্যাপ্টেনকাকা বুঝলেন। সুতরাং আর ভণিতা করলেন না—

বললেন—"পেশায় আমি ডাক্তার। ছিলাম আর্মিতে। রিটায়ার

করে প্র্যাকটিস করছি এখানে। কিছুদিন আগে একটা রুপোলি চোঙা দার্জিলিংয়ের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে কোবিং চা বাগানে পড়ে ফেটে যায়। ইলেকট্রিক বিভীষিকা দেখা দিয়েছে তারপর থেকেই।"

"রুপেলি চোঙা?" প্রফেসর যেন খুব সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হল।

"হ্যাঁ। দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেছিল। নইলে বলতাম উল্কাপাত।"

"নিশ্চয় স্যাটেলাইট। কক্ষপথ থেকে খসে পড়েছে।"

"উল্কা নয়, স্যাটেলাইটও নয়।" স্পষ্ট করে বললেন ক্যাপ্টেন কাকা।

'কেন নয়?" হেসে হেসে বললেও বেশ চোখা প্রশ্নই করলেন প্রফেসর, এবং ঝটিতি তার জবাবও দিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেনকাকা চোখে মুখে হেসে হেসেই।

"প্রফেসর, আর্মি এক্সপিরিয়েন্স ছিল বলেই আপনাকে ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড ফিগার সমেত অ্যান্সারটা দিতে পারব। গ্রেট সাইবেরিয়ান এক্সপ্লোশনের কথা নিশ্চয় ভোলেন নি?"

"১৯০৮ সালের তিরিশে জুন রাশিয়ার পূব অঞ্চলে—"

"টুঙ্গাসকায় নাকি হাজার হাজার টন ওজনের একটা বিকল মহাকাশযান শূন্যপথেই ফেটে গিয়ে বার হাজার বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করেছিল—এতই পাওয়ারফুল ছিল তার এনার্জি।"

"বাঃ! বাঃ! অনেক খবর রাখেন তো দেখছি!" হল কি প্রফেসরের? এত ফুর্তি তো অনেকদিন দেখা যায় নি ওঁর কথাবার্তায়!

"তা রাখি। আমার হবি যে তাই", থেমে থেমে বললেন ক্যাপ্টেন কাকা।

"হবি! গাঁজাখুরি ব্যাপারের হবি?"

গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেনকাকা—"গাঁজাখুরি কিনা জানি না, তবে বলিভিয়ার এক্সপ্লোশনে যে সাড়ে দশ মিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্র্যানাইট ভেপার হয়ে উড়ে গেছিল—সেটা চোখে দেখেছি।"

"বলিভিয়ায় ? কবে ? কখন ? কিভাবে ?" প্রফেসর বেশ নির্বিকার।

"আমি তখন ছিলাম বলিভিয়ার তারজা আর আর্জেন্টিনার বর্ডারে। হঠাৎ একটা দারুণ হুইসলিং শব্দ শুনলাম মাথার ওপর। দেখলাম লকলকে আগুনের শিখা দিয়ে ঘেরা একটা জিনিস উড়ে যাচ্ছে ১২০ মিটার উঁচু দিয়ে। তারপরেই শুনলাম বাজ পড়ার মতো শব্দ। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সারা শরীর।"

"আহা! আগে বলবেন তো ?" কাঁচুমাচু মুখে বললেন প্রফেসর- "তারপর ?"

"জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছেন ?" ক্যাপ্টেনকাকার কণ্ঠস্বর এবার একটু কঠিন।

"উড়ন চাকি ?"

"হ্যাঁ। সেইদিনই বিকালে সাড়ে চারটের সময়ে আবার সাংঘাতিক সেই হুইসলিং শব্দ শোনা গেল মাথার ওপর। প্রায় তিনশ' ফুট ওপরে দেখলাম আশ্চর্য এক দৃশ্য। একটা ধাতুর চোঙা। ক্রোম স্টীলের চাইতেও চকচকে। লালচে কমলা রঙের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরোচ্ছে সামনের দিক থেকে। লম্বাটে ডিমের মতো গঠন। নীলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।"

"বেশ ?" প্রফেসর এবার কিন্তু শুনছেন কান খাড়া করে।

"খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল অদ্ভুত সেই আকাশযান—ঘণ্টায় মাত্র ২২০ মাইল স্পীডে। দরজা, জানলার বালাই নেই—খোঁচা বেরিয়েও নেই কোথাও। প্রায় ৩০ ফুট, চওড়ায় ২০ ফুট। ঠিক যেন একটা কামানের গোলা—আর্টিলারি শেল—ক্রোম প্লেটেড। টার্গেটটা মনে হল ১২ মাইল দূরের এল টেয়ার পর্বতচূড়া !"

"ফাইন! তারপর ?" ঝুঁকে বসেছেন প্রফেসর। "কতদিন আগের ঘটনা বলেছেন বলুন তো ?"

"১৯৭৮ সালের ৬ই মে'র ঘটনা।—তিন মিনিট পনের সেকেণ্ড পরে চোঙাটা আছড়ে পড়ল টার্গেটে—মানে, এল টেয়ারের চুড়োয়। দারুণ ফ্ল্যাশে অন্ধ হয়ে গেছিল বেশ কিছু লোক। আলোর ঝলক দেখা

গেছিল ৯৩ মাইল দূরেও—মানে, প্রায় ৯০০ বর্গমাইল অঞ্চলের সবাই দেখেছিল আলোটা।"

"ব্রিলিয়াণ্ট!" প্রফেসরের প্রীত মন্তব্য।

"কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঘটল ভয়ঙ্কর এক্সপ্লোশন। ভেঙে গেল ৪৫ মাইল দূরের জানলার কাচ, শুনতে পেল ৫৭,০০০ বর্গমাইল অঞ্চলের প্রত্যেকে।"

"ফিগারগুলো বেশ মনে রেখেছেন তো?"

"রাখতে হয়েছে," চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা—"ভূমিকম্প দেখা দিল তারপরেই।"

"ওয়াণ্ডারফুল!" প্রফেসর কি তাতাচ্ছেন ক্যাপ্টেনকাকাকে?

"প্রায় পুরো সাউথ ডাকোটা জুড়ে ৭৫৪৭৭ বর্গমাইল অঞ্চলে টের পাওয়া গেছিল ভূমিকম্পের রেশ।—প্রফেসর, সাইবেরিয়ায় নাকি উল্কা পড়েছিল—লিভিয়ার ঘটনা নিজের চোখে দেখা। উল্কা বলে কি মনে হয়?

"না, না, কখনই নয়," সজোরে মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর।

"বেশির ভাগ উল্কাই পৃথিবীর দিকে ৩২,০০০ থেকে ৪৭,০০০ মাইলস পার আওয়ার স্পীডে ধেয়ে আসে। কখনও কখনও ঘণ্টায় ৯০,০০০ মাইল স্পীডও দেখা যায়। কিন্তু বলিভিয়ার উড়ুক্কু চোঙা এসেছিল খুব জোর ২২০ মাইলস পার আওয়ার স্পীডে।"

"রহস্যজনক ব্যাপার!"

"উল্কা নামে সোজাসুজি—দিকরেখার সঙ্গে প্রায় নব্বই ডিগ্রী কোণে। কিন্তু বলিভিয়ার এই বিভীষিকা নেমেছিল দিকরেখার মাত্র ২৭ ডিগ্রী কোণে।"

"বলিভিয়ার বিভীষিকা! বেড়ে নামটা দিলেন বটে।" প্রফেসর হাসছেন ফিক ফিক করে।

জ্বলন্ত চোখের ফ্ল্যাশ দেখলাম ক্যাপ্টেনকাকার রিমলেশ চশমার কাচ যুগলের আড়ালে।

বললেন দাঁতে দাঁত পিষে—"কেন দিয়েছি, সেটা পরের কথাটা শুনলেই বুঝবেন। রুপোলি চোঙার ঠিক পেছন পেছন উড়ে এসেছিল আর একটা চোঙা—সাইজে অনেক ছোট। প্রথমটা আছড়ে পড়তেই পেছনেরটা বাঁক নিয়ে উধাও হয়ে গেল আকাশে।"

"তারপর?" প্রফেসর এখনও নিরুত্তাপ।

"বলিভিয়ার মিলিটারী অথরিটি বেশ কিছুদিন হৈ চৈ করেছিল বটে—কিন্তু ধামাচাপা পড়ে গেল তদন্ত, যখন দেখা গেল সাড়ে দশ মিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্র্যানাইট ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই ঘটে নি।"

"আপনি কিছু অঘটন আশা করেছিলেন মনে হচ্ছে!" আচমকা প্রশ্ন করলেন প্রফেসর। কণ্ঠস্বরে ঢিলে ভাবটা আর নেই, তীক্ষ্ণতা এসেছে।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেনকাকার চক্ষুযুগলও "আজ্ঞে হ্যাঁ, আশা করেছিলাম। শুনবেন?"

"নিশ্চয়।"

"সাইবেরিয়ার এক্সপ্লোশন খুব বড় রকমের হয়ে গেছিল—কাজ হয় নি। বলিভিয়ার এক্সপ্লোশন তার চাইতেও কম হল—কিন্তু খুব সামান্য রকমের নয়—কাজেই সেখানেও কোনো ফল দেখা গেল না। তাই—" বলে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেনকাকা।

চেয়ে রইলেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রও। আমি তো বটেই।

ফিস ফিস করে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা—"বিফলে যায় নি দার্জিলিংয়ের এক্সপ্লোশন। ছড়িয়ে পড়েছে ইলেকট্রিক জার্ম।"

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেনকাকা। ভুরু আর কপাল কুঁচকে গেল। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে রইলেন জানলা দিয়ে বাইরের কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ের দিকে।

স্পষ্ট মনে হল কি যেন শুনছেন। ডাইনিং-হলে তখন জোর গুলতানি চলেছে। টেবিলে হাসিঠাট্টা চলেছে, স্টিরিও বাজছে।

ক্যাপ্টেনকাকার শূন্যগর্ভ চাহনি দেখে মনে হল না এসব শুনছেন।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমি আর প্রফেসর। ক্যাপ্টেনকাকা এমন কি শুনছেন যা আমাদের দুজনের কানেই ঢুকছে না!

আস্তে আস্তে চোখের পাতা নেমে এল ভদ্রলোকের ঈষৎ ড্যাবডেবে চোখ দুটোর ওপর। আধবোঁজা চোখে কি যেন ভাবছেন!

উঠে পড়লেন হঠাৎ। দ্রুতকণ্ঠে বললেন—"কাজ আছে। বাকিটা পরে বলব।"

দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন চটপট। সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর খরখরে চোখে তাকালেন আমার দিকে।

বললেন—"ফলো হিম। দেখে এসো কোথায় যান। তোমাকে যেন দেখতে না পান।"

হোটেলের ডাইনিং-হলটা রাস্তার ওপরেই। দরজা খুললেই চাতাল। দু'পাশের সিঁড়ি নেমে গেছে সটান রাস্তার ওপর। সকালের দিকে ঘোড়ায় চড়ে টুরিস্টরা জলাপাহাড়ের দিকে যায় আবার ফিরে আসে।

চাতালে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম একদল ঘোড়সওয়ারকে। হৈ হৈ করতে করতে টগবগিয়ে চলে গেল জলাপাহাড়ের দিকে।

ক্যাপ্টেনকাকা কোথায়?

ঐ তো—প্রায় দৌড়ে নেমে যাচ্ছেন নিচের গ্রামের দিকে। থসথসে বপুটা যেন শক্তির আঁধার। এত জরুরী কাজই যদি ছিল, আড্ডা মারতে এলেন কেন বুঝলাম না। তোফা প্রাতরাশটা আধখাওয়া অবস্থায় রেখে আসায় মেজাজ তখন ভাল নেই আমার। কিন্তু প্রফেসরের হুকুম—শুনতেই হবে। বুড়োর মুখখিঁচুনিও তো সহ্য হয় না।

দৌড়ে নেমে গেলাম রাস্তা ধরে। গ্রামে ঢুকলাম সেই প্রথম। নামছি তো নামছিই। ক্যাপ্টেনকাকাও পাঁই পাঁই করে দৌড়চ্ছেন বললেই চলে। ঘাড় বেঁকিয়ে ওপর দিকে তাকালাম। অনেক উঁচুতে

সানগোল্ড হোটেল দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের প্রায় তলায় চলে এসেছি বললেই চলে। ছোট ছোট কটেজ প্যাটার্নের বাড়ির শেষ নেই। পাহাড়ের ঢালু গায়ে একটার পর একটা কটেজ। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি ক্যাপ্টেনকাকাকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে গাঁয়ের লোক। একজন একটা ঘোড়ায় চড়ে আসছিল ম্যালের দিকে—ভাড়া খাটানোর জন্যে। ক্যাপ্টেনকে দৌড়ে নামতে দেখে ঘোড়া দাঁড় করাল সামনে। কি যেন বলল ঝুঁকে পড়ে। টপ করে নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে, আর লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলেন ক্যাপ্টেন। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ঘোড়ার।

চশমার কাচ ঝলসে উঠল ঠিক সেই সময়ে।

স্পষ্ট মনে হল পলকের জন্যে আমাকে দেখে নিলেন কাকা। যদিও আমি অনেক পেছনে। কিন্তু উনি যেন ঠিক আমার দিকেই তাকালেন।

পরক্ষণেই মুখ ঘুরে গেল ঘোড়ার। মোড় ঘুরে উধাও হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল অশ্বক্ষুরধ্বনি!

সব শুনলেন প্রফেসর।

শুনে-টুনে বললেন 'হুঁ।'

'হুঁ মানে?' ঠাণ্ডা ওমলেট গব গব করে খেতে খেতে বলেছিলাম আমি, 'ভদ্রলোকের চোখ দুটো দেখেছেন?'

'তুমি শুধু চোখই দেখলে? আর কিছু দেখলে না? বলেই অন্য কথায় চলে গেলেন প্রফেসর 'ফাইন ওয়েদার। চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।'

দুপুরবেলা সবে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকেছি আবির্ভূত হলেন ক্যাপ্টেনকাকা।

ঘরে ঢুকেই আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুত হেসে বললেন 'সরি। আর

একটা ঘোড়া থাকলে আপনাকে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু হাতে আর সময় ছিল না।'

আমি তো থ!

মিটি মিটি হাসছিলেন প্রফেসর। ফস, করে বললেন 'আপনার পেসেন্টের খবর কী? বাঁচানো গেল?'

চোখের পাতা ফেলতে বোধহয় ভুলে গেলেন ক্যাপ্টেনকাকা। সেকেণ্ড কয়েক ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে রইলেন প্রফেসরের দিকে। চেয়ে আছেন প্রফেসরও। মুখে সেই হাসি। যা মোনালিসার হাসির মতোই রহস্যময়।

থেমে থেমে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা 'প্রফেসর, তার কথাই বলতে এসেছি। লেটেস্ট কেস। অ্যানাদার এক্সপ্লোশন। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে মেয়েটা।'

তারপর যা বললেন, তা নড়িয়ে দিল আমার মগজের ঘিলু।

অন্য গ্রহ থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীরা যে পৃথিবী গ্রহে যাতায়াত করছে, স্পেসশিপ পাঠাচ্ছে, খবরাখবর নিচ্ছে এ সন্দেহ ক্যাপ্টেনকাকার অনেক দিনের। বলিভিয়ার সেই বিস্ফোরণের পর থেকেই।

তাই যখন দার্জিলিংয়ের ওপর দিয়ে রুপোলি চোঙা উড়ে গিয়ে ফেটে গেল চায়ের বাগান—উনি সেখানে ছুটে গেছিলেন সবার আগে।

''গেলাম বটে। কিন্তু বিশাল একটা গহ্বর ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। বলিভিয়ার সেই বিরাট গর্তের মতো নয় মোটেই। লোকজনের হৈ চৈ শুনলাম। উল্কাপাত বলেই মনে করেছে সবাই। কিন্তু উল্কার চিহ্ন যে নেই কোথাও সেটা মাথায় ঢুকছে না। যা ছিল চোঙার মধ্যে, তা ততক্ষণে ছড়াতে আরম্ভ করেছে দার্জিলিংয়ে।"

"কি ছিল চোঙার মধ্যে?" প্রফেসরের প্রশ্ন।

''ইলেকট্রিক জার্ম।"

''সেটা আবার কী?"

'প্রফেসর, প্রথম কেসটা এল চা বাগান থেকেই। একটি মেয়ের

জ্বর হয়েছে শুনে দেখতে গেছিলাম। স্বাভাবিক জ্বর নয় বলেই গেছিলাম। তাকে ছুঁলেই নাকি লোক ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে পড়েছে।”

“ইলেকট্রিক শক! বলেন কী মশায়!”

“আমি গিয়ে দেখলাম মেয়েটার বয়স পনেরর মধ্যে। ভুটিয়া মেয়ে। এমনিতে এদের চোখ ছোটো হয়। কিন্তু এর চোখ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। চোখের মেনিনজেস-এর ওপর যেন খুব চাপ পড়ছে। ব্রেনের মেনিনজেস-এর ওপরেও চাপ পড়েছিল বোধহয়। তাই প্রলাপ বকছিল। সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছিল।”

“যেমন?”

“আমি মনে মনে ভাবলাম, টেমপারেচার দেখা দরকার। মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে বললে—দরকার নেই। এ জ্বর থার্মোমিটারে ধরা পড়বে না। ইলেকট্রোমিটার আছে? ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা ধরা দরকার।”

“অ্যাঁ!” প্রফেসর বিমূঢ় হয়েছেন বলেই মনে হল। অভিনয়ও হতে পারে। বুড়ো কম ধড়িবাজ নন।

“আমি মনে মনে ভাবলাম, তাহলে তো তোমাকে ছোঁয়া যাবে না— শক খেয়ে মরব নাকি—মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে বললে, সরে পড়ুন। ডেঞ্জারাস লিমিট এসে গেছে। এক্সপেরিমেণ্ট ফেলিওর!”

“কি করলেন আপনি?”

“তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটাও সটান খাটের ওপর উঠে দাঁড়াল। সারা দেহ কাঁপছে থরথর করে। অচমকা স্পার্ক ছিটকে গেল সারা গা থেকে।”

“স্পার্ক?”

“ইলেকট্রিক স্পার্ক! তারপরেই আগুন ধরে গেল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। লাফিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘরের বাইরে। বিস্ফোরণটা শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে। ঘরের চাল পর্যন্ত উড়ে গেল এক্সপ্লোশনে।”

“মেয়েটা?”

"ফাটল তো মেয়েটাই। একেবারে নিশ্চিহ্ন।"

"ফাইন!" তৃপ্ত স্বর প্রফেসরের—"তারপর?"

কটমট করে তাকালেন ক্যাপ্টেনকাকা—"একই ব্যাপার ঘটে চলেছে পর-পর। সব পেশেন্টেরই বয়স তের থেকে ষোলর মধ্যে। কিশোর কিশোরী প্রত্যেকেই। কিন্তু মজাটা কি জানেন, বোধহয় গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণে তফাৎ থাকার ফলেই মেয়েরাই শুধু ইলেকট্রিক টেম্পারেচারে ভোগে, আগুন লেগে যায়, ফেটে উড়ে যায়—ছেলেরা দুদিন ভুগে সেরে ওঠে।"

"চোখ দুটো শুধু ড্যাবডেবে হয়ে থাকে, তাই না?" অমায়িক কণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

জ্বলন্ত চোখে তাকালেন ক্যাপ্টেনকাকা "আজ্ঞে হ্যাঁ। ধরেছেন ঠিক। ধরতে পারবেন জেনেই আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে এখানে।"

মিষ্টি মিষ্টি হাসলেন প্রফেসর—"তাই নাকি? তাই নাকি? অধমের ভূমিকাটা এখানে কি হতে পারে শুনতে পারি!"

"এতই যখন ধরতে পেরেছেন, এটাও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন অন্য গ্রহের এই ইলেকট্রিক জার্ম যার শরীরে ঢোকে, তাকে পুরোপুরি কব্জায় আনতে গিয়ে প্রথমেই তার ব্রেনের মধ্যে যে ক্ষমতটা জাগিয়ে দেয় তার নাম—"

"টেলিপ্যাথি," বিনয় ঝরে পড়ে প্রফেসরের গলায় "যেমন আছে আপনার। দূর থেকেই বুঝতে পারেন কে কি ভাবছে। নিচের গাঁয়ে পেশেন্টের ডাক শুনতে পান এই হোটেলে বসে। দীননাথ পেছন নিলে পেছনে না তাকিয়েও জানতে পারেন। ঠিক যেমন আপনার পেশেন্টরা ধরতে পারে আপনার মনের কথা। ঠিক কি না?"

ক্যাপ্টেনকাকার সাদা আঁচিলে ভরা মুখটা অদ্ভুত সবুজ হয়ে আসে এবার। রাগে লাল হতে দেখেছি। সবুজ হতে দেখি নি কখনো।

বীভৎস! গা শিরশির করে ওঠে আমার।

ভাঙা গলায় বললেন ক্যাপ্টেনকাকা—'প্রফেসর, আপনাকে ডেকে আনার উদ্দেশ্যটা শুনুন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আপনার কথা শুনবে—আমি বলতে গেলে তুড়ি মেরে তড়িয়ে দেবেন।"

"তা তো দেবেই।"

দপ করে জ্বলে উঠলেন ক্যাপ্টেনকাকা 'আমারও সময় ফুরিয়ে আসছে প্রফেসর, শেষ করতে দিন আমাকে।"

"সেটাও টের পেয়েছি।"

'টের পেয়েছেন কিভাবে?"

"আপনার ড্যাবডেবে চোখ দেখে। বলিভিয়াতেও ইলেকট্রিক জার্ম আপনার ভেতরে ঢুকেছিল—তাই না? ছেলে বলে জ্বলে মরেন নি, ফেটে পড়েন নি—শুধু টেলিপ্যাথি ক্ষমতাটা পেয়েছেন। আর পেয়েছেন—"

"বলুন আর কী?"

"আপনার প্রভুদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষমতা। বলুন ক্যাপ্টেন, বলে ফেলুন চটপট, কি বলতে চায় তারা।'

জানলা দিয়ে ক্যাপ্টেনকাকা তাকালেন আকাশের দিকে। চেয়ে রইলেন অনেক্ষণ। একেবারে তন্ময়—যেন ইহজগতে নেই। দেহ অনড়।

মিনিটখানেক পর ঝাঁকুনি খেল সারা দেহ।

বললেন প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে "এক্সপেরিমেন্ট। ইলেকট্রিক জার্ম মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে এক্সপেরিমেন্ট। জীবাণুর ক্ষমতা তো জানেন। মানুষ মাইক্রোসকোপে যা দেখতে পায় না, জীবাণু তা দেখতে পায়। মানুষ তত্ত্ব দিয়ে অ্যাটমের মধ্যে কটা ইলেকট্রন আছে হিসেব করে বার করে—জীবাণু তা চোখে দেখে বলে দিতে পারে। জীবাণুও একটা এনিম্যাল—প্রাণী—অনেক উন্নত স্তরের—কিন্তু মানুষ তাকে হেয়জ্ঞান করে এসেছে এতদিন। যদিও সব জীবাণুর স্বরূপ এখনও জানেনি মানুষ। জানতে পারে কেবল—জীবাণুরাই—

জাতিভাইদের সব খবর রাখে কেবল এরাই। প্রফেসর, অসংখ্য ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে, এক-একটা ছায়াপথে অসংখ্য সৌরজগৎ, এক-একটা পরমাণুর মধ্যে কি সেই প্যাটার্ন নেই ? একই প্যাটার্ন, একই ছক, একই নিয়ম। জীবাণুরাই জানে সেই খবর—মানুষকে তারা সেই জ্ঞান দিতে চায়, কিন্তু মানুষ কি করছে ? নিরীহ কিছু জাতের জীবাণু বাদে সমস্ত জীবাণুকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। শত্রু, জীবাণু মানেই যেন শত্রু ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ !"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ !" প্রতিধ্বনি করলেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র। "আপনি নিজেই তাহলে একটা জীবাণু হয়ে গেছেন এখন, তাই না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ক্যাপ্টেনকাকা "এতদিন ইলেকট্রিক জার্মের ইলেকট্রিসিটিকে মাথা চাড়া দিতে দিই নি। কিন্তু প্রভুদের বিফল এক্সপেরিমেণ্টের ফল ফলতে চলেছে আমার ওপরেও। বেশি বকাবেন না। গা ছুঁয়ে এমন শক দেব—"

সরে বসলাম আমি সভয়ে। প্রফেসর নির্বিকার।

বললেন, "এক্সপেরিমেণ্ট আনসাকসেসফুল হ'ল কেন ক্যাপ্টেন সাহেব ?

"মানুষের মস্তিষ্কই তার জন্য দায়ী। আমার প্রভুরা বুঝতে পারেন নি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে বড় বিস্ময় মানুষের মস্তিষ্ক। ওজন তো মোটে ১.৪৬ কিলোগ্রাম। জিলোটিনের মতো দেখতে ধূসর আর সাদা টিস্যুর একটা ব্যাঙের ছাতা যেন। জঘন্য ! কিন্তু তিন হাজার কোটি স্নায়ুকোষ আর তার পাঁচ থেকে দশ গুণ গ্লাইয়ার কোষ রয়েছে ঐটুকুর মধ্যে। দেড় কিলো ব্রেনের সামান্য অংশ কাজে লাগিয়েই মানুষ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে গেছে। সবটুকু লাগাতে গেলে সময় লাগবে আরও কয়েক লক্ষ বছর। তাই আমার প্রভুরা শক্তিমান জীবাণুদের পাঠিয়েছিল ব্রেনে ঢুকে ব্রেনটার ক্ষমতা বাড়িয়ে মানুষকে অতিমানুষ করে তোলার জন্যে। মহৎ উদ্দেশ্য নয় কী ?"

"বিলক্ষণ !" প্রফেসর বিপুল হর্ষে যেন ফেটে পড়েন।

'কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া অজ্ঞাত ব্রেন-কোষগুলো কি যে কাণ্ড করে বসল, মানুষের বায়ো-ইলেকট্রিসিটি ধাঁ করে বেড়ে গেল পরদেশী ইলেকট্রিক জার্ম ব্রেনে ঢুকে পড়তেই। ব্যস, আর যায় কোথা—আগুন লাগছে শরীরে, ফাটছে বোমার মতো। শুনেছেন তো, পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে অনেকে! এই তো সেদিন ফ্রান্সের একটা মেয়ে—"

"জানি, জানি। আপনি বলে যান।"

"আর বলে যান! সময় আমার শেষ, এতদিন প্রভুদের হুকুম শুনে দৌড়েছি ইলেকট্রিক জার্মদের কি হাল হল জানবার জন্যে—কিন্তু এই নচ্ছার মানুষের মগজ নাকানি-চোবানি খাইয়েছে প্রতিবার—এমন প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলেছে গোটা বডির মধ্যে···উঃ উঃ উঃ!"

ক্যাপ্টেনকাকা মুখ বিকৃত করে আর্তনাদ করে উঠতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রফেসর আমার নড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দৌড়লেন দরজার দিকে। চৌকাঠ পেরিয়েই করিডরে পড়ে পাশ ফিরে ছুটতে গিয়ে দেখলাম লকলকে আগুনের শিখা ঘিরে ধরেছে ক্যাপ্টেন-কাকাকে। ছিটকে যাচ্ছে অজস্র ইলেকট্রিক স্পার্ক!

রাস্তায় নেমে এসেছিলাম হুড়মুড় করে।

বিস্ফোরণটা ঘটল ঠিক সেই সময়ে। চোখের সামনে সানগোল্ড হোটেলের একটা অংশ ভেঙে গড়িয়ে গেল পাহাড় বেয়ে!

———

পাথর

ডেভিলকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম বেশ কিছুদিন আগে। 'পক্ষিরাজ' পত্রিকায় ছাপা হয় গল্পটা। সিউড়িতে আমার ভাগ্নে গল্পটা পড়েও কিন্তু আমাকে চিঠি লিখে জানায়নি স্বয়ং ডেভিল গল্পের বৃত্তান্ত জেনে চটেছে কিনা।

সত্যি কথা বলতে কি, ডেভিলকে ভয় করতে আরম্ভ করেছি। কুকুরকে আমি যেভাবে ভয় পেয়ে এসেছি চিরকাল —এ ভয় সে নয়। যে দিন থেকে জেনেছি, কুকুরদেহের ভেতরে অন্যগ্রহের প্রাণী রয়েছে, সেদিন থেকে ডেভিলকে আর সামান্য কুকুর বলে হেয় জ্ঞান করি না।

সিউড়ি ছেড়ে চলে এলাম তো ঐ কারণেই। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যেদিন দেখলাম ঘুমের ঘোরে আমাকে দিয়েই কাগজে নিজের কথা লিখিয়েছে ডেভিল—পরিচয় দিয়েছে নিজের—সেদিনই বিকেলের বাসে চম্পট দিয়েছি সিউড়ি ছেড়ে। চলে আসার সময় কেবল দেখেছিলাম, বড় বড় লোমের আড়ালে প্রায় ঢেকে যাওয়া অদ্ভুত দুটো সবুজ চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে ডেভিল।

কলকাতায় এসে কিন্তু স্থির থাকতে পারিনি। ছটফট করেছি। পাগলাডাঙ্গার মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছি, নতুন যে রাস্তাটা দমদম এয়ারপোর্ট থেকে গড়িয়া পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে ঝিলের ধার দিয়ে, ধূ-ধূ মাঠের বুক চিরে—একা একা সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। ডেভিল যেন ডেভিলের মতই আমাকে পেয়ে বসেছিল। অথচ জানি সে আমাদের, এই মানুষদের চেয়ে অনেক উন্নত, অনেক সভ্য প্রাণী—যার নাগাল ধরার ক্ষমতা আইনস্টাইন বেঁচে থাকলেও বোধহয় পেতেন না। সত্যেন বোস আর জগদীশ বোস হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক—অসম্ভবের মধ্যে বিজ্ঞান-কল্পনা করবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। গাছের

প্রাণ আছে—একথা বলতে গিয়ে অনেক হাসি-টিটকরি সহ্য করতে হয়েছিল জগদীশ বোসকে। আজকে সারা পৃথিবীর তাবৎ বৈজ্ঞানিক বসুবিজ্ঞান মন্দিরের নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

উপহাসকে উপেক্ষা করেন—এমনি একজন বিজ্ঞানসাধকের নাম অবশ্য জানি। তাঁর সান্নিধ্যেই থেকেছি এত দিন। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র অন্তত আমার এই কাহিনী বিশ্বাস করবেন।

পত্রিকায় ডেভিল কাহিনী ছাপা হওয়ার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে পাঠকমহলে। আমি তার তোয়াক্কা করি না। করি কেবল ডেভিলের—আর প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রের। প্রথমজন কিভাবে নিয়েছে তার গল্প—উৎকণ্ঠা সেই জন্যে। দ্বিতীয়জন কিভাবে নেবে—সেটা অবশ্য মোটামুটি জানি।

তাই ছুটলাম প্রফেসরের গবেষণামন্দিরে। উনি একটা গাছের গায়ে গ্যালভ্যানোমিটার লাগিয়ে ফিতের মত কাগজে ফুটে ওঠা রেখাচিত্র দেখে ডায়েরীতে কি সব নোট করছিলেন। আমার পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন।

বললেন—এসো দীননাথ, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

হঠাৎ?

গাছেরও চোখ আছে—অদৃশ্য চোখ। আমাদের সমস্ত কাণ্ড-কারখানা তারা দেখছে—খবর পাঠাচ্ছে গ্রহ-গ্রহান্তরে। এবারে আমি তা প্রমাণ করব।

বলে প্রফেসর যে আশ্চর্য গবেষণার কথা বলে গেলেন সে কাহিনী এরপরে বলা যাবে'খন। আমার মাথায় তখন ডেভিল ঘুর-ঘুর করছে। গ্রহ-গ্রহন্তারের কথা বলতেই গ্রহান্তরের প্রাণীর কথা না বলে পারলাম না। প্রফেসরের বকবকানি বন্ধ হতেই তাই বললাম ডেভিল বৃত্তান্ত।

গ্যালভ্যানোমিটারের কথা ভুলে গেলেন প্রফেসর। চোয়াল ঝুলে পড়ল আমার কথা শুনতে শুনতে। ঠিক এই সময়ে 'টেলিগ্রাম' বলে

হাঁক পাড়ল পিওন দরজার কাছে।

টেলিগ্রাম এসেছে আমার নামে—প্রফেসরের ঠিকানায়। পাঠাচ্ছে সিউড়ি থেকে আমার ভাগ্নে। আমি যেন এখুনি সিউড়ি রওনা হই। প্রফেসরকে আনতে পারলে খুব ভাল হয়।

সব শেষে হেঁয়ালি করেছে ভাগ্নে।

সংক্ষেপে লিখেছে, পাথরটা দেখলে মামা তুমি হতভম্ব হয়ে যাবে।

পাথর দেখে হতভম্ব হবো ? কেন ?

প্রফেসর এলেন না। তিনি গাছের চোখ নিয়ে তখন ব্যস্ত। আমি রামপুরহাটের স্টেট বাস ধরে সটান চলে এলাম সিউড়িতে।

রিক্সা থেকে সদর দরজার সামনে নামতে না নামতেই শুনলাম বাড়ীর মধ্যে অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল ডেভিল। অদ্ভুত গলা বললাম এই কারণে যে, ডাকটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল কেন জানি না—মনে হল ডেভিল যেন ভয় পেয়েছে। একরাশ উৎকণ্ঠা যেন ঝরে পড়ল অদ্ভুত ডাক-টার মধ্যে !

ডেভিলকে আমি নিজেই ভয় করি। তার ভয় পাওয়ার অব্যাখ্যাত অনুভূতিটা তাই রোমাঞ্চ জাগিয়ে গেল লোম কূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সোজা কথায়, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। অন্য সময়ে হলে অবাক হয়ে ভাবতাম, ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো ! দোতলার ঘর থেকে ডেভিল কি করে জানল সদর দরজায় আমি এসে পৌঁছেছি। তখন কিন্তু ও ধরণের কোন বিস্ময়বোধই জাগ্রত হলনা মনের মধ্যে। ডেভিল অপার্থিব অনুভূতি দিয়ে অনেক কিছুই জানতে পারে, এ অভিজ্ঞতা তো আমার আগেই হয়েছে।

সরু সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল আমার ভাগ্নে। বয়সের অনুপাতে খুব বেশী লম্বা আর প্রস্থেও তেমনি। চোখমুখে কিন্তু সারল্য মাখানো। তরতর করে নেমে আসার সময় দেখলাম, উত্তেজনায় চোখদুটো গোলগোল।

শেষের তিনটে ধাপ একলাফে পেরিয়ে একেবারে রাস্তায় পড়ল ভাগ্নে। রিকসা থেকে আমার স্যুটকেশটা নামিয়ে নিয়ে রিকসাওলাকে বললে—"দাঁড়াও, এখুনি আবার বেরোবো। আমাকে বলল—মামা, স্যুটকেশটা রেখে আসি—পাথরটা দেখিয়ে আনি আগে।'

মিনিট কয়েক পরে ছুটন্ত রিকসার মধ্যে ভাগ্নে বললে—'মামা, পরশু রাতে অমাবস্যা ছিল। পশ্চিম আকাশে হঠাৎ একটা লাল আলো দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল ডেভিল। তোমার লেখা ডেভিলের গল্প পড়ে আমরা তো হেসে খুন। বাবা বলছিল, তোমার নাকি মাংস খেয়ে পেট গরম হয়েছিল সেই রাত্রে। আর গুচ্চের সায়েন্সফিক্-সন গল্প পড়েছিলে। তাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলে। যাইহোক, সেই ডেভিল যখন পশ্চিম আকাশে লাল আলো দেখে ডেকে উঠল, তখন আমি ভেবেছিলাম বুঝি মঙ্গলগ্রহ দেখে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু দেখতে দেখতে আলোটা বড় হয়ে উঠল। তারপরেই সমস্ত আকাশ জুড়ে আগুনের স্রোত বয়ে গেল যেন। আশ্চর্য সেই আগুনের খেলা না দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না মামা। লকলকে লাল-নীল-হলুদ আগুনের শিখা মেঘের মধ্যে থেকে যেন ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে চারদিকে ঢেউ খেলে ছুটে গেল—কিন্তু মাটি পর্যন্ত এসে পৌঁছোল না। বাবা বাড়ী ছিল। জানোইতো, জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে বাবা চর্চা করেন। আগু--নের খেলা দেখে বললে, প্রায় আলোর স্পীডে ধূলিকণা এসে পৃথিবীর বাতাসে আছড়ে পড়ছে বলে অমন আগুনের স্রোত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ধূলিকণা আসছে কোত্থেকে—মহাশূন্যের কোন অঞ্চল থেকে, সেটা জিজ্ঞেস করতেই বাবা আমতা আমতা করে বললে, তোর মামাকে জিজ্ঞেস করিস। এই কথা বলতে না বলতেই লাল আলোটা বিরাট থালার মত হয়ে উঠল। মস্ত আগুনের গোলা হয়ে দাউদাউ করে জ্বলতে জ্বলতে নেমে এল। আমাদের বাড়ীর ওপর দিয়ে তেড়চা-ভাবে ছুটে গেল। উল্কা সাঁৎ করে খসে পড়ে—কিন্তু এই আগুনের গোলাটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানকে যেন জয় করেছে মনে হল।

স্লোস্পীডে নেমে গেল গাছপালার ওপর দিয়ে পুলিশগ্রাউণ্ডের দিকে। তারপরেই রামধনু রঙের রোশনাই দেখলাম পুলিশ গ্রাউণ্ডের দিকে। যেন অনেক আতসবাজি পোড়ানো হচ্ছে মনে হ'ল সেদিকে। আস্তে আস্তে রঙের ছটা মিলিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়ে গম্ভীর গলায় একবার ডেকে উঠল ডেভিল। ঐ একবারই। আর নয়।

আমি আর বাবা বারান্দা থেকে চেয়েছিলাম পুলিশ গ্রাউণ্ডের দিকে। ডেভিলের ঐ একবার মাত্র ডাকের পরেই নীরবতার কারণ খুঁজতে ঘরে ঢুকলাম। ভেবেছিলাম, ইঁদুর-টিদুর মেরেছে—তাই জানান দিল। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলাম, গায়ের লোম প্রায় খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাটা। আমি ওর লটপটে কানদুটো আচ্ছা করে মুচড়ে দিয়ে বললাম—'এই ডেভিল···ডেভিল।' ডেভিল কিন্তু দেখলাম কাঁপছে। বিশ্বাস করো মামা, স্পষ্ট দেখলাম, হাত দিয়েও টের পেলাম—ডেভিল কাঁপছে। কেন যে কাঁপছে, তা কিন্তু বুঝতে পারলাম না। তবে সমস্ত রাত আমার পায়ের কাছে বসে রইল। সকালবেলা মা বললে, ডেভিল সারা রাত ঘুমোয়নি। ঐ জানলার দিকে চেয়েছিল। জানোই তো, তোমার বোন নাইটবার্ড—রাতজাগা পাখী। তাই অন্ধকারে দেখেছে ডেভিলের সবুজ চোখদুটো কোন দিকে চেয়ে আছে। যে জানলার দিকে চেয়েছিল, সে জানলার দিকে পুলিশগ্রাউণ্ড—যেখানে রামধনু রঙের ছটা দেখা গেছে আকাশ থেকে আগুনের গোলা খসে পড়ার পর।

সকালবেলা ডেভিলকে নিয়ে বেরোতে হয় ওর পেট খালি করানোর জন্যে। আমিই বেরোলাম সেদিন, উদ্দেশ্য পুলিশগ্রাউণ্ডে একটা চক্কর মেরে আসা। ডেভিল কিন্তু বেঁকে বসল। অন্য দিন সিঁড়ি দিয়ে নেমেই চেন টেনে নিয়ে যায় ঐদিকেই। সেদিন চেন টেনে নিয়ে গেল উল্টো-দিকে—বাজারের দিকে। যতই টানি, ততই ও আমাকে উল্টো টান মারে। মহা জ্বালালো! কানমুলে দিলাম,

পেটে লাথি কষালাম—কিন্তু কাঠগোঁয়ার ব্যাটাচ্ছেলে কিছুতেই গেল না পুলিশগ্রাউণ্ডের দিকে।

আমার তখন রাগ হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে এসে ওকে বাবার হাতে গছিয়ে দিয়ে যেই নিচে নেমেছি সাইকেল বার করার জন্যে, অমনি আবার গতরাতের মত অদ্ভুতভাবে একবার ডেকে উঠেই চুপ করে গেল ডেভিল।

কুকুর সিক্সথ সেন্স দিয়ে অনেক জিনিস টের পায়—আমাদের ষষ্ঠ অনুভূতি নেই—ওদের তা আছে। ঐ জন্যেই নিশ্চয় পুলিশ-গ্রাউণ্ডের রহস্য ও টের পেয়েছে—অন্য গ্রহের প্রাণী ওর মধ্যে আছে —তোমার ঐ সব গাঁজা-গল্প আমি একদম বিশ্বাস করি না—তোমার গল্প পড়ে তাই তো তোমাকে চিঠি লিখিনি।

'যাই হোক, ডেভিলের ডাক শুনে আরো রোখ চেপে গেল আমার। সাইকেল নিয়ে কয়েকমিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম পুলিশগ্রাউণ্ডে। গতকাল রাতের আগুনের গোলা কোথায় পড়েছে, তা খুঁজতে হল না। দূর থেকেই দেখলাম, কবরখানা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে লম্বা লম্বা গাছের পাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। মাঠের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে গেলাম। সাইকেল রেখে ভিড় ঠেলে গিয়ে দেখলাম অনেকখানি মাটি আগুনের গোলায় পুড়ে গেছে। ঘাস-ফাস জ্বলে গেছে। মাটি কালো হয়ে গেছে। শুধু পুড়েই যায় নি—যেন খাল কাটা হয়ে গিয়েছে। পঞ্চাশ ষাট ফুট লম্বা একটা খাল—পাঁচ ছ ফুট গভীর। প্রথম দিকে কম গভীর শেষের দিকে বেশ গভীর। আগাগোড়া কালো ছাইয়ে ঢাকা। গর্তের শেষ প্রান্তে পড়ে রয়েছে একটা পাথর।

লোকের ভিড় এই পাথরকে ঘিরে। কালোরঙের পাথর। সারাগায়ে অজস্র ফুটো—ঝামাপাথর যেমন হয় আর কি। এবড়ো খেবড়ো—তেলতেলে মসৃন গোলাকার মোটেই নয়। এই পাথরটাই কাল রাতে আগুনের গোলা হয়ে খসে পড়েছে—মাটি ফেটে আটকে

গেছে। উল্কার টুকরো নিঃসন্দেহে। কিন্তু দুটো ব্যাপারে খটকা লাগল। উল্কা অমন স্লো-স্পীডে নামবে কেন? দ্বিতীয়তঃ উল্কা পড়ার আগে কি আকাশজোড়া আগুনের স্রোত বয়? পড়বার পর কি রামধনুর ছটা দেখা যায়!

মনের মধ্যে খটকা লাগল বলেই দূরে সাইকেল শুইয়ে মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। ভিড়ভাট্টা পাতলা হলে কাছ থেকে দেখতে হবে পাথরটাকে।

ঘণ্টা তিন-চার বসে রইলাম এইভাবে। সেদিন ছুটির দিন নয়—অফিসের তাড়া আছে, স্কুলে-কলেজে যাওয়ার তাড়া আছে—তাই মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল একসময়ে। সামান্য একটা পাথরকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেতে থাকার মত মানুষ কজন থাকে—নরানাঃ মাতুলক্রমঃ বলেই আমি হয়েছি মামার মত হাফ-ম্যাড। তাই থেকে গেলাম মাঠ ফাঁকা না হওয়া পর্যন্ত।

তারপর গুটি গুটি গিয়ে দাঁড়ালাম পাথরটার সামনে। খুব বড় পাথর নয়—লম্বায় চওড়ায় ফুটখানেকের বেশী নয়—বিয়ে বাড়ীর ডেকচি দিয়ে অনায়াসেই চাপা দেওয়া যায়। আমি কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম খুব কাছ থেকে পাথরটাকে দেখে। গর্তের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে হেঁট হয়ে চেয়েছিলাম। পাথরের গায়ে ফুটোগুলো বেশ গভীর—যেন পাথরের ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে। "মামা, ঠিক সেই সময়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত হল আমরা সত্ত্বায়। তোমার গল্প পড়ে তোমার ল্যাংগুয়েজ ইউজ করছি তোমার বোঝবার সুবিধে হবে বলে! হঠাৎ আমার মনে হল, পাথরের ঐ ফুটোগুলো যেন চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

"মামা, হেসো না। হাসি তোমাকে মানায় না। পাথর কখনো চেয়ে দেখে না। কিন্তু কেন যে সেদিন অমন মনে হল, তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। স্পষ্ট মনে হল, পাথরের গায়ে ঐ অজস্র ছেঁদাগুলো যেন এক-একটা চোখ। পাথরটা যেন জীবন্ত। হাজার

চোখ মেলে একদৃষ্টে দেখছে আমাকে।

"গা শিরশির করে উঠল আমার। দিন-দুপুরে গোরস্থানের পাশে বসে গা ছমছম করে উঠল। কিন্তু মন থেকে ভয় তাড়িয়ে আরো ভাল করে চেয়ে রইলাম। আর ঠিক তখনি স্পষ্ট মনে হল আমার আর পাথরের মধ্যে রয়েছে যেন একটা অদৃশ্য ডাণ্ডা—ডাণ্ডার একদিকে পাথর—আর একদিকে আমি। ডাণ্ডাটা যেন একটু একটু করে টানছে আমাকে—পাথরের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছি একটু একটু করে—মাথার মধ্যেও যেন কি রকম ঝিমঝিম করছে—একটা চিড়িং চিড়িং ভাব মাথার কোষে কোষে অনুভব করছি—খুব অল্প ইলেকট্রিক কারেন্ট যেন—একটা চিন্‌চিন্ ভাব।

"ডেভিলের ভয়ে কাঁটা হওয়া চেহারাটা চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠল। আসবার সময়ে পেছন ডেকেছিল যেভাবে—কাল রাতে এই পাথরটা আকাশ থেকে পড়তেই ডেকে উঠেছিল সেই একইভাবে। আজ সকালে টানা-হ্যাঁচড়া করেও তাকে এদিকে আনা যায়নি। আর এখন মনে হচ্ছে অপার্থিব এই পাথর যেন জীবন্ত—সহস্র চোখ মেলে যেন আমাকে হিপনোটাইজ করতে চাইছে।

"এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগের মধ্যে এই ভাবনাগুলো মাথার মধ্যে খেলে যেতেই সম্বিৎ ফিরে পেলাম আমি। দূর থেকে ডেভিলই আমার সম্বিত ফিরিয়ে দিল কিনা—তা তুমিই ভাল বলতে পার। সম্বিৎ ফিরে পেতেই আমি দেখলাম গর্তের মধ্যে প্রায় মাথা ঢুকিয়ে বসেছি—আর একটু হলেই পড়ে যাব।

"লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম, অদৃশ্য আকর্ষণটা কমজোরি হয়েই আবার প্রবল হয়ে উঠল। আমি কিন্তু রামভীতুর মত পেছন ফিরেই টেনে দৌড় লাগালাম। সাইকেল তুলেই ফুল-স্পীডে প্যাডেল করে বাড়ী ফিরে এলাম। সিঁড়ির গোড়ায় ব্রেক কষতে শুনলাম ওপরের ঘরে আবার সেইরকম একবার মাত্র অদ্ভুত ডেকে উঠেই চুপ করে গেল ডেভিল।"

পুলিশ গ্রাউণ্ডের পাশের রাস্তা দিয়ে গোরস্থানের এ মাথায় এসে দাঁড়িয়ে গেল রিক্সা। ফিরব এই রিক্সাতেই। তাই রিক্সা দাঁড় করিয়ে গোরস্থানের পাশ দিয়ে এগোলাম লম্বা লম্বা গাছগুলোর দিকে। যেতে যেতে ভাগ্নে বললে—"মামা, পোকা-কে তুমি দেখেছো? পাশের বাড়ীতে থাকে, ক্লাশের ফার্ষ্টবয়। আমি লাষ্টবয় বলে ঘেন্না করে না। বরং সেই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আমি যখন সাইকেল থেকে নামছি সিঁড়ির গোড়ায় পোকা নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে।"

"বলল—'কোথায় গেছিলি?' আমি বললাম কোথায় গেছিলাম এবং এইমাত্র কি দেখে এলাম। ও আমার ঘাম-ভেজা চেহার খানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—বিজ্ঞানের যুগে পাথরের চোখ থাকে না। রাত জেগে পড়ে তোর চোখ খারাপ আর মাথা খারাপ হয়েছে। পাথরটাকে দেখবো বলেই তোকে ডাকতে এসেছিলাম। তুই যা ভয় পেয়েছিস, তোকে নিয়ে আর যাব না—একাই যাচ্ছি।" বলে পোকা হন্‌হন্‌ করে চলে গেল পুলিশগ্রাউণ্ডের দিকে।

"বিকেলবেলা পোকার বাবা খুঁজতে এল ওকে। আমি অবাক হয়ে বললাম—'সেকি! ওতো সকালবেলা পুলিশগ্রাউণ্ডে উল্কার পাথর দেখতে গেল।"

'পোকাকে পুলিশগ্রাউণ্ডেই পাওয়া গিয়েছিল, মামা। পাথরের পাশে গর্তের মধ্যে চুপ করে বসেছিল। বাবাকে চিনতে পারেনি, মা-কে পারল না। আমাকেও না। চেনা জানা হঠাৎ সব অচেনা হয়ে গেছে। তাই বলে যে পাগল হয়ে গেছে, তা নয়। খুবই প্রকৃতিস্থ—কেবল স্মৃতি বলে আর কিছু নেই। এমন কি, স্কুলের কোনো পড়াই আর মনে নেই। অ আ ক খ অক্ষর পর্যন্ত চিনতে পারছে না। পাথর যেন ওর স্মৃতির ভাঁড়ার লুঠ করে নিয়েছে—শূন্য মস্তিষ্ক নিয়ে কেবল বেঁচে আছে। আবার নতুন করে ওকে সব শিখতে হবে, জানতে হবে।"

বলতে বলতে লম্বা লম্বা গাছগুলোর তলায় এসে গেলাম।

পোড়া ছাই ভর্তি কালো লম্বা খালের মত গর্তটা চোখে পড়ল। গর্তের শেষ প্রান্তে একটা কালো পাথর। এবড়ো-খেবড়ো। সহস্র ছিদ্রময়।

দূর থেকেই দেখলাম পাথরটাকে। কাছে গেলাম না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক রহস্য, অনেক বিভীষিকা আছে। নিরীহদর্শন পাথরের সান্নিধ্যে থেকে পোকার মত স্মৃতিশূন্য হওয়ার মত বাসনা আমার ছিল না। তাই দূর থেকেই পাথর দর্শন করে ফিরে এলাম ঝটপট।

এইটুকু বুঝেছিলাম, পাথরের রহস্য ডেভিল জানে। তাই সেই রাত্রে মশারীর মধ্যে ঢুকলাম ডটপেন আর খাতা নিয়ে। বালিশের পাশে রাখলাম। মশারীর একটা পাশ আলগা করে রাখলাম যাতে ডেভিল নিজে থেকে ঢুকতে পারে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। যা ভেবেছিলাম, দেখলাম ঠিক তাই হয়েছে—মাথার কাছে রাখা কাগজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ডট-পেন দিয়ে কয়েকটা লাইন লিখেছি। যে লিখিয়েছে, সেই ডেভিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চোখের কোটরে দু-টুকরো সবুজ আগুন জ্বালিয়ে নির্ণিমেষে দেখছে আমাকে।

ডেভিল যা লিখিয়েছে তা এই ঃ

বন্ধু, এই গ্যালাক্সির মাঝখানে আবার একটা সুপারনোভা দেখা গিয়েছে। জানো তো, মহাশূন্যের স্তিমিত মৃতপ্রায় তারকাকে বলে নোভা। এদের তাপ আর জ্যোতির উৎস নিঃশেষিত হয়ে উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছে। এই সংকোচনের ফলেই এদের ভেতরকার জ্বলন্ত অংশ বেরিয়ে আসে তাই মাঝে মাঝে হঠাৎ এদের উজ্জ্বল দেখায়। কখন কখন এই ধরনের স্তিমিত তারকার বা নোভার ভেতরকার জ্বলন্ত আর গলিত পদার্থের পরমাণবিক রূপান্তরের ফলে উত্তাপ হঠাৎ অত্যধিক বেড়ে যায়—হঠাৎ বিশেষ উজ্জ্বল দেখায়। এই অবস্থায় একে বলে 'সুপারনোভা'।

সুপারনোভার আশপাশে গ্রহগুলোয় তাই আর থাকা যাচ্ছের না। বাস্তুত্যাগীরা দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে মহাশূন্যের দিকে দিকে।

তোমাদের গ্রহে এমনি একটা দল এসে নেমেছে। পাথরটা ওদের মহাকাশযান। জীবন্ত মনে হয়েছে ওরা ভেতরে রয়েছে বলে। ওরা প্রথম পর্যায়ে এই পৃথিবীর সবার ব্রেণ লুঠ করবে—জ্ঞানীগুণীদের স্মৃতি কেড়ে নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের মালিক হবে—তারপর সেই জ্ঞানের সঙ্গে নিজেদের জ্ঞান যোগ করে এই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে।

পোকার স্মৃতির ভাঁড়ার খালি করে দিয়েছে এরাই। পৃথিবীর বাইরেও এরা যোগাযোগ রেখেছে—খবর পাঠিয়েছে। আসছে আরো মহাকাশযান। এমন খাসা গ্রহ আর এমন নির্বোধ প্রাণী ওরা আর দেখেনি। এই বিপদ থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারে কেবল একজন—প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র। তাঁকে তুমি গিয়ে শুধু বলো, সুপারনোভার র‍্যাডিয়েশনের ফলেই এক মাইক্রনের দশভাগের এক ভাগ সাইজের ধূলিকণাগুলো আলোকের গতিবেগ অর্জন করেছে—পৃথিবীর বাতাসে আছড়ে পড়ছে—তাই আগুনের খেলা দেখা দিয়েছে। এইটা বললেই উনি বুঝবেন কি করতে হবে—আর দেরি কোর না—আজই তাঁকে নিয়ে এসো।

সন্ধ্যায় প্রফেসরকে নিয়ে ফিরলাম সিউড়িতে। উনি একটা বড় বেতের বাস্কেট এনেছিলেন সঙ্গে। তার মধ্যে কি আছে, তা আমাকেও বলেননি।

বাস থেকে নেমেই উনি পুলিশগ্রাউণ্ডের দিকে রওনা হলেন। তখন রাত ন'টা। আকাশে তারার মেলা। পুলিশগ্রাউণ্ড আর গোরস্থানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভিন্‌গ্রহীদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছেন কিন্তু শুধু ঐ বাস্কেটটা নিয়ে—আর কিছু নয়।

লম্বা লম্বা গাছগুলোর তলা পর্যন্ত যেতে হল না। গোরস্থানের অন্ধকারে গা মিলিয়ে একটু এগোতেই একটা আলোকরশ্মি দেখলাম মিলিয়ে গেল আকাশের দিকে। মেঘলোক ফুঁড়ে মহাশূন্যে ছুটে গেল। পেন্সিলের মত সরু আলোকরশ্মিটা—লেজার রশ্মির মতই সরু হয়ে

রইল—সাধারণ আলোকরশ্মির মত ছড়িয়ে পড়ল না।

থমকে গিয়েছিলেন প্রফেসর। পেছনে আমি। গাছপালা আর কবরের ফাঁক দিয়ে দেখলাম আলোকরশ্মিটা বেরোচ্ছে ছাই ঢাকা গর্তের মধ্যে পড়ে থাকা পাথরটার গা থেকে।

সেই সঙ্গে দেখলাম আরো একটা বিচিত্র দৃশ্য!

পাথরটার হাজার ছেঁদা দিয়ে ধোঁয়ার মত কি যেন বেরিয়ে এসে পাকখাচ্ছে পাথরটাকে ঘিরে! সবুজ রঙের ধোঁয়া। গাঢ় কুয়াশার মত অনেকটা। নিছক ধোঁয়ার মত আকারহীন নয় কিন্তু—পাক খাওয়া ধুম্রপুঞ্জের মধ্যে হাজার রকমের আকার যেন জমাট বেঁধে মিলিয়ে যাচ্ছে পরক্ষণেই।

বৃদ্ধ প্রফেসর ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলেন সেই দিকে। বিড়বিড় করে কি যেন বললেন আপনমনে, আস্তে আস্তে হাতের পেল্লায় বাস্কেটটা রাখলেন মাটির ওপর। ঢাকা খুললেন। অন্ধকারে টের পেলাম কি যেন টেনে বার করলেন ভেতর থেকে। তারপরেই আচমকা টানে দৌড়ালেন পাথরের দিকে—বাধা দেওয়ার সময় পর্যন্ত দিলেন না।

উনি যেই গাছপালার আড়াল থেকে মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন, অমনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল পাথরটা। টকটকে লাল, উজ্জ্বল সবুজ, হলুদ কমলা, নীল, বেগুনি তুঁতে রঙের সাতরঙা ছটায় ছেয়ে গেল চারদিক। ঠিক এই রামধনু রোশনাই প্রথম রাতে দেখেছিলাম পুলিশগ্রাউণ্ড থেকে ঠিকরে যেতে।

প্রফেসর তখনো দৌড়াচ্ছেন। রামধনু আলোয় দেখলাম, তিনি দু-হাতে ধরে আছেন একটা মস্ত গামলা—বিয়েবাড়ীর পান্তুয়া রাখার গামলা যেন। এমনভাবে গামলাটা মাথার ওপর তুলে দৌড়াচ্ছেন যেন গামলা চাপা দেবেন পাথরটাকে ঝপাং করে।

পাথরের ধোঁয়া-বাসিন্দারাও (কে জানে জানে ধোঁয়ার আকারে তারা সত্যিই প্রাণী কিনা) নিশ্চয় আঁচ করেছিল প্রফেসরের মতলব। আচমকা রামধনু রঙের একটা ছটা অগ্নিশিখার মত লকলকিয়ে ছিটকে

গেল তাঁর দিকে। গা স্পর্শ করার আগেই যেন অদৃশ্য থাপ্পড়ে উনি ছিটকে গেলেন মাটিতে—হাতের গামলা গড়িয়ে গেল একদিকে।

প্রদীপ্ত পাথরটা এবার দুলে উঠল। মহাকাশযানের মতই ফুট-খানেক শূন্যে ভেসে উঠল। চারপাশের ফুটোগুলো দিয়ে ধোঁয়াগুলো দ্রুত এঁকেবেঁকে পাথরের মধ্যেই অদৃশ্য হল! জেগে রইল কেবল সরু পেন্সিলের মত আলোকরশ্মি—যে আলোকরশ্মি মেঘলোক ফুঁড়ে বিস্তৃত দূর মহাকাশপানে।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন প্রফেসর। গামলাটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটলেন। কিন্তু কাছ পর্যন্ত যাওয়ার আগেই সরু পেন্সিলের মত অলোকরশ্মি বেয়ে পাথরটা উঠে গেল তালগাছ সমান উঁচুতে।

নিচ থেকে চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর—নেমে আয়! নেমে আয় ভীতুর ডিম কোথাকার! তোদের জারিজুরি খতম করি কি করে দেখে যা—পালাচ্ছিস কেন?

পাথরটা কিন্তু অকস্মাৎ গতিবেগ বাড়িয়ে নক্ষত্রবেগে পেন্সিলের মত আলোকরশ্মির পথ বেয়েই যেন উড়ে গেল মেঘলোকের পানে। নিচ থেকে মনে হল আলোকরশ্মিটাই যেন চুম্বকরশ্মির মত পাথরটাকে টেনে নিয়ে গেল দূর হতে দূরে—আলোর ছোট্ট বিন্দুটা তারার মত ছোট্ট হয়ে গিয়ে একসময়ে মিলিয়ে গেল কালো আকাশে।

অন্ধকারে গামলা হাতে দাঁড়িয়ে রাগে ফুসতে লাগলেন প্রফেসর।

আমি কাছে গেলাম। অভিভূত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম—প্রফেসর, কিসের গামলা এটা?"

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর—"ন্যাকা নাকি! তুমিই তো বললে সুপারনোভার র‍্যাডিয়েশনের ফলে ধূলিকণাগুলো আলোকের গতিবেগ অর্জন করছে।"

আমতা আমতা করে বললাম—"তা বলেছি। কিন্তু দেখে ওরা ভয়ে পালালো কেন?"

"ঐ একই র‍্যাডিয়েশনের শক্তিতে ওরাও শক্তিমান বলে। ওদের

সেই শক্তি গামলা চাপা দিয়ে শেষ করে দিতাম।"

"কি ছিল গামলায়?"

"তোমায় বলব কেন? তোমায় বলা মানেই তো সিক্রেট ফাঁস করে দেওয়া। সীসের সঙ্গে এমন কয়েকটা ধাতু মিশিয়ে এ গামলা বানিয়েছি যার মধ্যে দিয়ে কোনো অদৃশ্যরশ্মির বিকিরণ যেতে পারে না—ফলে, গামলা চাপা পড়লে বাইরের জগতের জাতভাইদের সঙ্গে বাছাধনদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যেত—শক্তির উৎস থেকে শক্তির জোগানও আর আসত না। নমুনা বানিয়ে রেখে দিতাম অ্যালকোহলে ডুবিয়ে—ইস্, একটুর জন্যে······!"

মাথার সামান্য ক'টা চুলই ছিঁড়তে লাগলেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র।

উল্কা

প্রথম সংঘাতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল মহাকাশযানের সামনের অংশটা। অতিকায় টিনের পাত্রর মুখ খুলে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনভাবে কেটে দু'ভাগ হয়ে গেল সামনেটা। ভেতরকার মানুষগুলো ছিটকে গেল মহাকাশের বুকে। ডজনখানেক চকচকে রূপোলি মাছকে কে যেন মুঠোর মধ্যে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে অনন্তের মাঝারে, নিরন্ধ্র সমুদ্রের বুকে। আর, তারপরেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল অত বড় মহাকাশযানটা। লক্ষ লক্ষ টুকরোয় তা ছড়িয়ে গেল, হারিয়ে গেল, ভেসে গেল অসীমের অন্ধকারে—দিশেহারা সূর্যের সন্ধানে যেন উড়ে গেল এক ঝাঁক প্রদীপ্ত উল্কা।

তারপর, সব স্তব্ধ।

"সিতাংশু, সিতাংশু, কোথায় তুমি ?"

শীতার্ত রাত্রে পথহারা একদঙ্গল ছেলের কণ্ঠে যেরকম আকুতি ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনি আর্তস্বর বেজে ওঠে একে একে প্রত্যেকের স্বরে।

"রাজেন, রাজেন !"

"ক্যাপ্টেন !"

"সুকৃতি, সুকৃতি, আমি জয়ন্ত।"

"জয়ন্ত, আমি সুকৃতি। কোথায় তুমি ?"

"জানি না। কি করে বলি বল ! ওপর দিক কোন্‌টা ? হায় ভগবান, আমি যে পড়ে যাচ্ছি !"

সত্যিই ওরা পড়ছিল। শীতকালের ঝরা পাতার মতই মহাকাশের মধ্যে দিয়ে পতন ঘটছিল ওদের। বিরাট চড়কবাজি থেকে ছিটকে পড়া আগুনের ফুলকির মতই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল ওরা। আর,

তারপর মানুষের বদলে শোনা গেল শুধু তাদের কণ্ঠস্বর—বিভিন্ন খাদে বিচিত্র স্বরলহরীর সমাবেশ। কারও স্বরে ভয়, কারও স্বরে নিরাশা। কেউ নির্বিকার, আবার কেউ হয়ত আঘাতের আকস্মিকতায় আচ্ছন্ন।

"আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।"

সত্যিই তাই। মাথার ওপর দিয়ে পা তুলে দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে ভেসে যেতে যেতে সিতাংশু বুঝেছিল বাস্তবিকই ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে পরস্পর কাছ থেকে। বিভিন্ন পথে ওরা ভেসে চলেছে এবং কোনমতেই এক জায়গায় ফিরে আসা আর সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। আগাগোড়া বায়ু-নিরোধক স্পেস-স্যুট পরেছিল ওরা। ফ্যাকাশে মুখগুলো বন্ধ ছিল কাঁচের বর্তুলের আড়ালে। কিন্তু দুর্ঘটনাটা এমনই আচম্বিতে ঘটে গেল যে ফোর্স ইউনিট পরে নেওয়ার সুযোগ আর ওরা পায় নি। ফোর্স ইউনিট সঙ্গে থাকলে মহাকাশ সমুদ্রের বুকে ছোট ছোট লাইফ-বোটের মতই ওরা ভেসে থাকতে পারত। খুশীমত এদিকে ওদিকে নড়াচড়া করে নিজেদের বাঁচাতে পারত, সঙ্গীদের বাঁচাতে পারত। তারপর সবাই একত্র হয়ে একটা মানুষ দ্বীপ সৃষ্টি ক'রত বা নতুন কোন পরিকল্পনা বাতলিয়ে যা হয় কিছু একটা করত। কিন্তু কাঁধের ওপর ফোর্স ইউনিট না থাকা মানেই ওরা কতকগুলো উল্কা ছাড়া আর কিছুই নয়। অচেতন জড়পদার্থের মতই নিরুপায় অসহায় অবস্থায় ওদের ভেসে চলতে হচ্ছে পৃথক পৃথক পথে—এমন এক অদৃষ্ট-অভিমুখে যা এড়িয়ে যাওয়ার কোন পথই আর নেই।

মিনিট দশেকের মধ্যে আতঙ্কের প্রথম ঝোঁকটা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এল। নেমে এল থমথমে নীরবতা। তারপর আবার শুরু হলো মহাকাশের বুকে স্বর তরঙ্গের আনাগোণা—ঠিক যেন একটা কালো তাঁতের এদিকে-ওদিকে বিশেষ একটা ধারা নিয়ে অনেক সুতোর যাতায়াত।

"সিতাংশু বলছি, জয়ন্তকে। ফোন মারফৎ আর কতক্ষণ কথাবার্তা চলবে বল তো?"

"সেটা নির্ভর করছে আমাদের পরস্পরের গতিবেগের ওপর। অর্থাৎ তুমি কত বেগে চলেছ তোমার পথে আর আমি কত জোরে চলেছি আমার পথে।"

"খুব জোর ঘণ্টাখানেক। আমার তো তাই মনে হয়।"

"হতে পারে।" উদাসীন শান্ত স্বরে বলল জয়ন্ত।

মিনিটখানেক পরে আবার শুধোয় জয়ন্ত—"আসল ব্যাপারটা কি বল তো?"

"ব্যাপার আবার কি? ফেটে গেল রকেটটা—ব্যস, আর কিছু না। রকেট তো হামেশাই ফাটে এতে অবাক হবার কিছু নেই।"

"আমরা চলেছি কোন্ দিকে?"

"আমার তো মনে হচ্ছে সূর্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হবে আমার।"

"আর আমার লাগবে পৃথিবীর সঙ্গে। মায়ের কোলেই ফিরে চলেছি। তবুও নির্ভয় হই কি করে বল? গতিবেগ আমার ঘণ্টায় দশ হাজার মাইল। দেশলাইয়ের কাঠির মতই দপ করে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাব আমি।"

দৃশ্যটা অনুমান করে বিচিত্র অনুভূতি জেগে ওঠে জয়ন্তর মনে। ওর মনটা যেন দেহপিঞ্জর ছেড়ে বেরিয়ে যায়—মহাশূন্য থেকে লক্ষ্য করতে থাকে ওর ধাবমান শরীরটিকে। মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে নেমে চলেছিল ওর দেহ। নামছে তো নামছেই। নামার কি আর শেষও নেই?

বাকী সবাই নির্বাক। প্রত্যেকেই ভাবছে নিজের নিজের ভাগ্যলিপি। কার যাত্রা কোথায় গিয়ে শেষ হবে, তা কেউই সঠিক জানে না। শূন্যের মধ্যে দিয়ে নেমে আসার অনুভূতি ছাড়া আর কোন অনুভূতি কারো নাই। এবং এ পতন রোধ করার মত পন্থাও জানা নেই কারো। এমনকি ক্যাপ্টেনও নিশ্চুপ। তাছাড়া আর উপায় কি! কি আদেশ সে দেবে? মহাশূন্যের মাঝে ভাসমান এই ক'টা অসহায় মানুষকে একত্র করার কোন পরিকল্পনাই তো আসছে না তার মাথায়।

নীরবতা ভেঙে কে যেন গুঙিয়ে ওঠে—"হায়রে, নামার কি আর শেষ নেই! আর কত নামব, কোথায় গিয়ে ঠেকব? উঃ ভগবান, আমি মরতে চাই না. মরতে চাই না, এভাবে নিঃসহায় অবস্থায় আমি মরতে চাই না!"

"ও কে?"

"জানি না।"

"অর্জুন নিশ্চয়। অর্জুন, তুমি কি কাঁদছ?"

"আমি মরতে চাই না, এভাবে এত নিচে নেমে আমি মরতে চাই না।"

"অর্জুন, আমি সিতাংশু কথা বলছি। অর্জুন, শুনছ?"

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। আরও দূরে সরে যেতে লাগল ওরা পরস্পরের কাছ থেকে।

"অর্জুন।"

"বলুন।" জবাব আসে এবার অর্জুনের দিক থেকে।

"অর্জুন, আমরা সবাই তো একই দরিয়ায় ভাসছি। তবে আর কেন মন খারাপ করছ?"

"আমি এখানে মরতে চাই না। অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে যেতে চাই আমি।"

"নিশ্চয় যাব আমরা। যা হয় একটা সুযোগ আমরা নিশ্চয় পাব, ভাই।"

"দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেছে দেখছি!" কে যেন বিদ্রূপ-তরল কণ্ঠে বলে ওঠে।

"চোপরাও!" গর্জে ওঠে ক্যাপ্টেন সিতাংশু।

"চলে আসুন, চলে আসুন, কাছে এসে চুপ করিয়ে দিন আমায়।" শ্লেষ যেন ঝরে ঝরে পড়ে তার কণ্ঠ থেকে। অশান্ত সান্যাল। এ গলা তারই। পাগলের মত এবার অট্টহাস্য করে ওঠে অশান্ত। বলে—"কই, আসুন, এসে চুপ করান আমাকে! হাঃ হাঃ হাঃ!"

ক্রোধে থর থর করে কেঁপে ওঠে ক্যাপ্টেনের সর্বশরীর। কিন্তু নিরুপায় সে। দুর্বিনীত অশান্ত সান্যালকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায় ক্যাপ্টেন অনেক দিন ধরেই মনের মধ্যে রেখেছিল। আজকে সবকিছুর মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও নিরুপায় সে। এরকম অক্ষম অবস্থা কল্পনাতেও আনা যায় না।

পড়ছে তো পড়ছেই। নিঃশব্দে হু হু করে নেমে আসছে। যতি নেই, বাধা নেই, মন্দগতি নেই—শুধু অবিরাম, অবিশ্রাম বেগে একনাগাড়ে পতন অনুভূতি ছাড়া আর কোন উপলব্ধিও নেই!

তারপরেই অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করেই যেন দু'জন আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠে। আতীক্ষ্ণ স্বরলহরী এসে আছড়ে পড়ে জয়ন্তর কানের পর্দায়। যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে জয়ন্ত দেখতে পায় ওদেরই একজনকে। খুবই কাছে ভাসছিল লোকটা। আতীব্র আর্তনাদে মহাকাশ চকিত করে একদম পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল সে।

"চুপ কর!" কড়া গলায় চীৎকার করে ওঠে জয়ন্ত।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ঐভাবেই চীৎকার করতে করতেই বুঝি সে এগিয়ে যেতে চায়। লক্ষ লক্ষ মাইল সে এমনি করেই কাতর আর্তনাদে চরাচর ব্যাপ্ত করে যেতে চায়। ফল হবে কি, রেডিও রেঞ্জ না পেরোনো পর্যন্ত অন্যান্য কারো পক্ষে আর কথাবার্তা বলাও সম্ভব হয়ে উঠবে না তার ঐ তারস্বরে চেঁচানির শব্দে।

হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় লোকটাকে। তাই ভাল। চট করে হাত এগিয়ে দেয় জয়ন্ত। আর একটু—আর একটু। এবার ওর আঙুল স্পর্শ করে লোকটার দেহ। শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরে ওর গোড়ালি। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় ঠেলে ওঠে নিজে, যতক্ষণ না লোকটার মাথা এসে পৌঁছয় ওর হাতের নাগালে। বিকট চীৎকার করে উঠে ক্ষিপ্তের মত জয়ন্তকে আঁকড়ে ধরে লোকটা। জলে ডুবতে ডুবতে প্রাণের তাগিদে মানুষ যেমন খড়-কুটো যা পায় তাই আকড়ে

ধরে প্রাণপণ শক্তিতে ঠিক তেমনি সে-ও আর ছাড়তে চায় না জয়ন্তকে। আর সেই সাথে সমানে চলতে থাকে আর্তনাদের পর আর্তনাদ। মহাশূন্যের প্রতিটি দিকে ভেসে যায় সেই ভয়াবহ আর্তস্বর।

এস্পার না হয় ওস্পার। জয়ন্ত ভাবে, হয় পৃথিবী আর না হয় উল্কার রাশি—এই যে কোন একটির সঙ্গে সংঘর্ষেই তো পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হবে এই কাপুরুষ লোকটা। তাই যদি হয়, তবে আর দেরী কেন। ওর বিধিলিপিকেই একটু ত্বরান্বিত করে দিলে দোষ কি!

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে লৌহ-মুঠি তুলে প্রচণ্ড আঘাত হানলে জয়ন্ত লোকটার কাঁচের মুখোসের ওপর। চুরমার হয়ে গেল বর্তুল-মুখোস। স্তব্ধ হয়ে গেল আর্ত চীৎকার। দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে জয়ন্ত। পাক খেতে খেতে নিষ্প্রাণ নশ্বর শরীরটা ভেসে গেলে নিজের পথে—পতনের পথে।

অনন্তকাল ধরে কি জয়ন্তকে এই ভাবে পড়তে হবে? পড়েছে তো পড়ছেই। বিরাম কি আর নেই! নীরব বিভীষিকার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সঙ্গীসহ এই পতন-অনুভূতি যে কোন ভাষাতেই ব্যক্ত করা যায় না।

"ক্যাপ্টেন, আছ তো?"

কথা বলে না ক্যাপ্টেন। রাগে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে ওর কান-মুখ-মাথা।

"আমি অশান্ত সান্যাল।"

অশান্ত স্পর্ধার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। চিরকাল যে 'আপনি' সম্বোধনে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, আজ সে এক ধাক্কায় নেমে এসেছে 'তুমি'র পর্যায়ে। প্রচণ্ড ক্রোধে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠলেও সংযতকণ্ঠে বলে সিতাংশু—"বল, কি বলবে?"

"একটু কথা বলা যাক। তাছাড়া তো করার কিছু নেই।"

ক্যাপ্টেন বলে—"বাজে কথা না বলে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় ভাব।"

"ক্যাপ্টেন, তুমি বেশী বাজে কথা বলা বন্ধ করবে কি?" বলে অশান্ত।

"কি?"

"কি বলেছি, তা তো শুনতেই পেয়েছ, ক্যাপ্টেন। তোমার ঐ ঠুন্‌কো উচ্চপদের বড়াই আর আমার কাছে ক'রো না। আমার কাছ থেকে তুমি যখন হাজার দশেক মাইল দূরে, তখন আর ছেলেখেলা নাই বা করলে।"

"অশান্ত!"

"গোল্লায় যাও! এ হচ্ছে শুধু একজনের বিদ্রোহ। তাতে আমার একগাছি কেশও স্পর্শ করতে পারবে না তুমি। তোমার রকেটটাই ছিল বাজেমার্কা, আর তুমি নিজেও একটা তৃতীয় শ্রেণীর রাবিশমার্কা ক্যাপ্টেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, শীগগিরই সূর্য তোমায় রোষ্ট করে ফেলুক।"

"অশান্ত" আমার অর্ডার, চুপ করো তুমি!"

"চালাও, চালাও, আরও একবার অর্ডার চালাও।" দশ হাজার মাইল দূর থেকে অট্টহাস্য করে ওঠে অশান্ত সান্যাল। স্তব্ধ হয়ে থাকে ক্যাপ্টেন। আবার বলে অশান্ত—"গেলে কোথায় জয়ন্ত? হাঃ হাঃ হাঃ! আমি ঘৃণা করি—অন্তর থেকে ঘৃণা করি তোমাকে—আজ নয়, বহুদিন থেকে।"

বৃথাই ক্যাপ্টেনের হাতের মুঠি কঠিন হয়ে ওঠে।

আচম্বিতে ফস্ করে আগুনের ঝিলিক দিয়ে একটা উল্কা বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। চোখ নামিয়ে জয়ন্ত দেখে তার বাঁ'হাতটাও উধাও হয়েছে সেই সাথে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ বায়ুশূন্য হয়ে যায় ওর স্পেস-স্যুট। কিন্তু ফুসফুসে তখনও যতটুকু বাতাস ছিল, তারই শক্তিকে অবলম্বন করে কোনরকমে ডানহাত তুলে বাঁ হাতের কনুইয়ের ভালভ্-এ একটা মোচড় দেয় ও। সন্ধিস্থলটা বেশ করে চেপে ধরে ফুটোটা বন্ধ করে দেয়। সমস্ত জিনিষটা এত

তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে আশ্চর্য হওয়ার মত সময়ও পেল না জয়ন্ত আশ্চর্য হওয়ার আর আছেই বা কি ! যে পরিস্থিতিতে সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে, সেখানে বিস্ময় বলে আর কিছু নেই। ছিদ্রটা বন্ধ হয়ে যেতেই মুহূর্তের মধ্যে বাতাসে ভরে ওঠে স্পেস-স্যুট। বাতাসের চাপ স্বাভাবিক হয়ে উঠতেই কনুইয়ের নবটায় আরও মোচড় দেয়। ফিনকি দিয়ে রক্তপড়া অনেকটা কমে আসে—তবুও চাপ কমায় না জয়ন্ত। বরং আরও একটু বাড়িয়ে দেয়।

মুখ বুঁজে কাজ করে চলেছিল জয়ন্ত। কিন্তু বিরাম নেই হরিহরের কথা বলার। সমানে বকবক করে চলেছে সে। মঙ্গলগ্রহের বৌ আর শুক্রগ্রহের বৌ, অমুকগ্রহের বৌ আর তমুকগ্রহের বৌ-এর বৃত্তান্ত যখন শেষ হলো, তখন শুরু হলো তার অগাধ অর্থ, বিপুল প্রতিপত্তি আর চমকপ্রদ জীবনের কাহিনী। বিরাম নেই তার বচনের. বিরাম নেই সবার পতনের। মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতে যেতে তবুও মশগুল হয়ে রইল হরিহর তার অতীতের স্বপ্নে।

অদ্ভুত ! সত্যিই, বড় অদ্ভুত। হাজার হাজার মাইল ব্যেপে মহাকাশের মধ্যে শুধু থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে কতকগুলো কণ্ঠ। দেখা যাচ্ছে না কাউকেই। শুধু বেতার-তরঙ্গে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে আর আবেগে উদ্বেল করে তুলছে অন্যান্য সবাইদের।

কখনো উন্মনা থেকে, কখনো কথার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কাটায় জয়ন্ত। কতক্ষণ ? মহাশূন্যের মাঝে মহাকালের হিসেব রাখার মত মনের অবস্থা কি তখন ওদের আছে ! বিচিত্র এক দার্শনিক বোধ পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল ওদের প্রতিজনের চেতনার দিক হতে দিগন্তে। অকল্পনীয় মৃত্যুর সামনাসামনি এসে সারা জীবনটা চলচ্চিত্রের মতই মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল। জীবনের সাফল্যের জন্যে নেই আনন্দবোধ, নেই বেদনার কশাঘাত ব্যর্থতার স্মৃতিতে। সবকিছু আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এক বিচিত্র অনুভূতিতে।

হঠাৎ জয়ন্ত চমকে ওঠে। চোখ নামিয়ে বোঝে ওর ডান পা নেই !

উল্কার চকিত আঘাতে এবার ওকে খণ্ডও হতে হলো তাহলে। হাসি পায় ওর। পরম দুঃখের হাসি। স্যুট থেকে আবার বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে হাত দিতে রক্তয় মাখামাখি হয়ে যায়। গোড়ালির নিচ থেকে স্যুট সমেত পায়ের পাতা অদৃশ্য হয়েছে। মহাশূন্যের মাঝে মৃত্যুর কি মহিমা! এখানে মৃত্যু হয় খণ্ড খণ্ড করে। ঠিক যেন একটা অদৃশ্য কশাই এসে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে যেতে থাকে শরীরের এক-একটা অংশ! হাঁটুর কাছে ভাল্‌ভটা এঁটে দেয় জয়ন্ত। আতীব্র যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে ওর চেতনা। কিন্তু অজ্ঞান হলে চলবে না। চেতনার আঁধারের ওপরে যেভাবেই হোক মাথা তুলে রাখতে হবে। মনের সঙ্গে দারুণ লড়াই শুরু হয়ে যায় ওর দেহের। ভাল্‌ভটা এঁটে দিতেই আবার বাতাসের চাপ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শিরদাঁড়া সিধে করে জয়ন্ত। সবকিছুর ওপরে আবার জেগে ওঠে পতনের অনুভূতি। বিরামবিহীন সীমাহীন পতনের অনুভূতি।

"অর্জুন, তুমি কোথায়?"

"অর্জুন?"

সবাই কান খাড়া করে উত্তরের প্রত্যাশায়।

কোন উত্তর নেই।

"উধাও হয়েছে বোধহয়।"

"আমার তা মনে হয় না। অর্জুন!"

আবার সবাই কান খাড়া করে।

তারপর, প্রত্যেকের ফোনে একটা মৃদু শব্দ ভেসে আসে। টেনে টেনে অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নেওয়ার ক্ষীণ শব্দ।

"ঐ তো! শুনতে পাচ্ছো?"

"অর্জুন!"

উত্তর নেই।

শুধু শোনা যায় সেই ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাস।

"অর্জুন উত্তর দেবে না।"

"ও বোধহয় পাগল হয়ে গেল।"

"চুপ। ঐ শোনো—"

শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আর নেই। সব চুপ, শান্ত।

"শেষ হয়ে গেল। মহাশূন্যের মাঝে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল অর্জুন। আমাদের চাইতে অনেক সুখী ও, অনেক ভাগ্যবান।"

আচম্বিত কার তীক্ষ্ণ চীৎকার বেজে উঠল ফোনে।

"ও কে?" শুধোয় জয়ন্ত।

"আমি।" অশান্ত সান্যালের কণ্ঠ।

মহাশূন্যের আর একদিক থেকে চেঁচিয়ে ওঠে জয়ন্ত—"কি ব্যাপার? চেঁচিয়ে উঠলে কেন?"

"এক ঝাঁক উল্কার মধ্যে এসে পড়েছি আমি। মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে যেমন ক্ষুদে গ্রহ দেখা যায়, অনেকটা সেরকম।"

"উল্কা?"

"আমার মনে হয় এটা মিরমিডন (Myrmidon) ঝাঁক। পাঁচ বছর অন্তর যে ঝাঁকটা মঙ্গলগ্রহের পাশ দিয়ে পৃথিবীর দিকে আসে, সেইটা। ঠিক মাঝখানে এসে পড়েছি আমি। এ যেন একটা অতিকায় ক্যালিডস্কোপ। কত রঙ, কত রূপ, কত আকার। কি সুন্দর!"

নিস্তব্ধ।

"আমি তাহলে এদের সঙ্গেই চললাম।" আবার শোনা যায় অশান্তর কণ্ঠ বহু যোজন দূর থেকে। "আমাকে নিয়ে চলল এরা। হাঃ হাঃ হাঃ!"

ওকে শেষবারের মত দেখার আশা নিয়েই বুঝি অসীমের পানে চোখ ফেরাল জয়ন্ত। কিন্তু মহাকাশে ছড়ানো অগুন্তি অতিকায় মণিমুক্তা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না ওর। হীরে আর নীলকান্ত আর মরকত কুয়াশা। মহাশূন্যের বেগুনি কালি আর কৃষ্ট্যাল অগ্নির সাথে মিশানো ঈশ্বরের অশ্রুত বাণী। উল্কার ঝাঁকে পড়ে অশান্ত সান্যাল অনন্তযাত্রা করছে ভাবতেই আশ্চর্য লাগে।

যে অশান্তকে কিছুক্ষণ আগে কঠিন শাস্তি দিতে না পেরে নিষ্ফল অক্রোশে জ্বলে উঠেছিল জয়ন্ত, তারই এহেন পরিণাম কল্পনা করে শিউরে ওঠে। মঙ্গলের পাশ দিয়ে পৃথিবীর দিকে প্রতি পাঁচ বছরে একবার ফিরে আসবে অশান্ত সান্যাল আর মিরমিডন ঝাঁক। অনন্তকাল ধরে চলবে ওর এই যাত্রা। মূহুর্তে মূহুর্তে শুধু বিশাল ক্যালিডস্কোপে সহস্র রামধনু রঙ পালটাবে, লক্ষ জহরৎ তাদের রোশনাই ছড়াবে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলবে এ একই দৃশ্যের, একই যাত্রার পুনরাবৃত্তি।

"চললাম, জয়ন্ত।" বহুদূর থেকে ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে আসে অশান্তর।

"চললাম। বিদায়।"

"ঈশ্বর তোমার সহায় হ'ন।" তিরিশ হাজার মাইলের ব্যবধান থেকে বিদায় সম্ভাষণ জানায় জয়ন্ত মৃত্যুপথযাত্রীকে।

"এখনও তামাসা!" আরও ক্ষীণ হয়ে আসে অশান্তর কণ্ঠ। তারপর সব চুপ।

নিবিড় হয়ে আসে তারকাবাহিনী।

একে একে সব স্বরই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথে এগিয়ে চলেছে বিপুল গতিতে। কারও গন্তব্য সূর্য্য, কারও মহাকাশের আরও ভেতরে। আর জয়ন্ত? চোখ নামায় ও। সে শুধু একাই ফিরে চলেছে পৃথিবীতে।

"বিদায়।"

"ঘাবড়াও মাৎ।"

"বিদায়।" সিতাংশুর কণ্ঠ।

চলে বিদায় জানানোর পর্ব। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাঙ্গ হয় তা।

তারপর একে একে খসে খসে পড়ে বিরাট মস্তিষ্কটা। রকেট-করোটির মধ্যে আবদ্ধ থেকে থেকে কয়েকটি মানুষ মিলেমিশে এই মস্তিষ্ক গড়ে তুলেছিল, সুদূর পৃথিবী থেকে মহাকাশের বুকে পাড়ি জমাবার

সাহস দেখিয়েছিল, কত বিপদ-আপদের মধ্যে থেকেও একসাথে ভাবতে পেরেছিল, সজীব করে রেখেছিল নিষ্প্রাণ রকেট-পোতকে—আজ একে একে সেই এককগুলিই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল। আর ধীরে ধীরে অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসতে লাগল সবকার। রকেটের বিস্ফোরণ ঘটে এই মহা-মস্তিস্কে। অচেতন খণ্ডগুলো ভেসে যায় দূর হতে দূরে। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে বেতার তরঙ্গ, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়! তারপর সব স্তব্ধ। নিথর নীরবতায় আবার ভরে ওঠে বিপুল মহাকাশ। একলা জয়ন্ত শুধু নামতে থাকে।

ক্যাপ্টেন গেছে সূর্যের দিকে। অশান্ত সান্যাল উল্কার ঝাঁকে পড়েছে। অর্জুন ভেসে চলেছে একাকী—নিষ্প্রাণ, নিথর। সিতাংশু

চলেছে প্লুটোর দিকে। হরিহর, রাজেন,—প্রত্যেকেই ধেয়ে চলেছে নিজের নিজের পথে।

আর জয়ন্ত! আগামীকাল রাত্রে সে আছড়ে পড়বে পৃথিবীর বায়ুস্তরে।

চক্ষের নিমেষে জ্বলে উঠবে সে। ছাইগুলো ছড়িয়ে পড়বে বাতাসে তারপর আস্তে আস্তে নেমে আসবে জমির বুকে। উর্বরা জমি আরও সুফলা হয়ে উঠবে তার দেহাবশেষ পেয়ে।

দ্রুত নেমে আসতে লাগল ও। বুলেটের মত ধেয়ে চলল সবুজ পৃথিবীর বুকে। একটা নুড়ি পাথর, অথবা লোহার টুকরো যেভাবে খসে পড়ে, ঠিক সেইভাবেই শূন্য পথে নেমে আসতে লাগল ওর দেহ। ওর মনে আর ভয় নেই, ক্লেশ নেই, দুঃখ নেই, আনন্দ নেই। নির্বিকার নিরবয়ব মন নিয়ে উল্কাগতিতে ধেয়ে চলল জননী জন্মভূমির কোলে।

"পৃথিবীর বায়ুস্তরে আছড়ে পড়লেই দপ করে জ্বলে উঠব আমি উল্কার মত," আপনমনে ভাবে জয়ন্ত। "আচ্ছা, তখন কি কেউই আমায় দেখতে পাবে না?"

গাঁয়ের রাস্তায় মায়ের হাত ধরে যাচ্ছিল একটা ছোট্ট ছেলে। হঠাৎ সে চিৎকার করে ওঠে—"মা, মা, ঐ দেখ, তারা খসে পড়ছে।"

একটা জ্বলন্ত সাদা তারা খসে পড়ে বাংলার আকাশ থেকে—প্রদোষের আঁধারকে চমকিত করে।···

———

যে মেশিন ভাবতে পারে

"তুমি কি সত্যি সত্যিই মনে কর যে তোমার আমার মতই মেশিনও মাথা খেলাতে পারে, ভাবতে পারে, সমস্যার সমাধান করতে পারে ?"

কল্যাণাক্ষ তখুনি কোন উত্তর দিলে না। টেবিলের ওপর বিভিন্ন কায়দায় সাজাতে লাগল তাসগুলো। প্রশ্ন করলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দেওয়া বেশ কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি ওর মধ্যে। জটিল প্রশ্নের উত্তর ভাবতে সময় লাগে, কিন্তু অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে কিছু শুধোলেও চটপট সাড়া দেওয়ার কোন স্পৃহাই দেখা যায় না ইদানীং। হপ্তার পর হপ্তা ধরে দেখে আসছি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বিচিত্র অভ্যাসটি। কিন্তু রকম-সকম দেখে বুঝেছি উত্তর দিতে এত সময় নেওয়ার কারণ ভারিক্কেপনা দেখানোও নয়, অথবা মনে মনে তোলপাড়া করাও নয়। ও আসলে সব সময়ে তন্ময় হয়ে থাকে অন্য কিছু নিয়ে। চৌপর দিনরাত কিসের চিন্তা যেন কুরে কুরে বসে যাচ্ছে ওর মনের গভীরতম কন্দরে। বিমনা থাকার কারণ এইটাই, আর কিছু না।

কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিলে কল্যাণাক্ষ।

বলল, 'যন্ত্র কাকে বলে ? অনেকভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকরকম সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে শব্দটার। আভিধানিক সংজ্ঞা কি ? না, যন্ত্র তাকেই বলে যার দ্বারা শক্তিকে প্রয়োগ করা হয়, কার্যকর করা হয় অথবা অভীপ্সিত ফলাফল সৃষ্টি করা হয়। তাই যদি হয়, তাহলে মানুষও কি যন্ত্র নয় ? মানুষও যে ভাবে অথবা ভাবে যে সে ভাবছে—তা তো আর তুমি অস্বীকার করতে পারো না।"

একটু গরম হয়ে বলি, "আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে না

থাকলে, পষ্টাপষ্টি বলে ফেললেই পারো। প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে এত হাবিজাবি বকার তো কোন প্রয়োজন নেই। ভাল করেই জানো তুমি যে, যন্ত্র বলতে আমি মানুষকে বোঝাই নি। মানুষ যাকে গড়ে এবং পরিচালনা করে তাকেই বলি যন্ত্র।"

"কিন্তু যখন সে তাকে নিজের অধীনে রাখতে পারে না"—বলে আচম্বিতে লাফিয়ে উঠে জানলার সামনে গিয়ে অপলকে তাকিয়ে রইল ঝড়ো রাতের কুচকুচে কালো আঁধারের পানে। আমি কিন্তু অনেক চোখ চালিয়েও মসীলিপ্ত বাগানের কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। ক্ষণেক পরেই একটু হেসে ফিরে এসে বসে পড়ল কল্যাণাক্ষ। বলল, "কিছু মনে কর না, তোমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু আভিধানিক সংজ্ঞাটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। ও সংজ্ঞার আওতায় মানুষও এসে পড়বে কিনা? যাই হোক, তোমার প্রশ্নের সহজ সরল পরিষ্কার উত্তর দিতে আমার কোন অসুবিধে নেই এবং তা এখুনি দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, যে কাজ দিয়ে যন্ত্রকে চালু রাখা হয়, তা নিয়ে সে ভাবতে পারে অনায়াসেই।"

উত্তরটা সোজাসুজিই বটে। কিন্তু তবুও তা ভাল লাগল না একটি বিশেষ সন্দেহ মনের কোণে উঁকি দেওয়ায়। কেমন জানি সন্দেহ হলো আমার, অহোরাত্র মেশিন-শপে কাজের মধ্যে ডুবে থেকে কল্যাণাক্ষের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কতটা হয়েছে জানা নেই, তবে তার চেয়েও অনেক বেশী হয়েছে অন্যদিক দিয়ে। আমি জানতাম, অনিদ্রা, রোগে প্রায় কষ্ট পেতে হয় ওকে। এবং রোগের প্রকোপ যে নিতান্ত হাল্কা ধরনের নয়, তাও অজানা ছিল না। ব্যাধিটা শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ওর মনকে পেঁচিয়ে ধরে নি তো? তখন অবশ্য ওর উত্তর শুনে মনে হয়েছিল, বাঃ, চমৎকার, খাসা জবাব তো! কিন্তু এখন যখন সে কথা ভাবি, তখন মনে হয় অন্য কথা। তখন বয়স ছিল কাঁচা, এবং অজ্ঞতা যে তারুণ্যের একটা মস্তবড় প্রকৃতি, তা তো আর কারও অজানা নেই! কাজেই, এ-হেন চাঁচা-ছোলা উত্তর শুনে

বাগবিতণ্ডার মস্ত সুযোগ পেয়ে গেলাম।

বললাম, "তাই নাকি? বন্ধু, তাই যদি হয় তাহলে বুঝিয়ে দাও দিকি বিনা মস্তিষ্কে কি করে চিন্তা করতে সক্ষম সে?"

উত্তরটা এল একটু দেরীতে। অবশ্য ততটা দেরীতে নয় যতটা লক্ষ্য করেছিলাম আলাপের শুরুতে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে চট করে পাল্‌টা প্রশ্ন করে বসল ও—

বলল, "বিনা মস্তিষ্কে গাছপালা কি করে চিন্তা করে শুনি?"

"আরে, গাছপালার কথা ছেড়ে দাও। ওদেরকে আমি দার্শনিকদের পর্যায়ে ফেলি! আচ্ছা, তোমার কথাই মেনে নিয়ে বলছি। মাথা খেলিয়ে আজ পর্যন্ত ক'টা সিদ্ধান্তে তোমার গাছপালারা পেঁছোতে পেরেছে বল দিকি। প্রমাণ নিয়ে আর কষ্ট কর না, শুধু ফলাফলগুলো বলে ফ্যাল।"

আমার স্থূল শ্লেষটুকু যেন ওকে স্পর্শই করল না। ও বললে, "ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেই তোমার প্রশ্নের আংশিক জবাব পেতে। লজ্জাবতী লতার কথা বাদ দিলাম। কীটভুক কয়েকটা ফুলের কথাও বললাম না। পরাগ-কেশর নামিয়ে যে সব ফুল পরাগ ছড়িয়ে দেয় মৌ-লোভী মৌমাছিদের ওপর দূর-সঙ্গীদের কাছে তা পৌঁছে দিয়ে তাদের ফলবতী করার জন্যে—তাদের কথাও না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনা বলি শোন। কিছুদিন আগে আমার বাগানে খোলা জমিতে একটা পরাশ্রয়ী লতা পুঁতেছিলাম! মাটির ওপর লতাটা মুখ বার করতে না করতেই গজখানেক দূরে একটা কাঠি পুঁতে দিলাম মাটির ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে লতাটা এগিয়ে চলল কাঠিটার দিকে। কয়েকদিন বাদে তা কাছাকাছি যখন পেঁাচেছে তখন কাঠিটা নিয়ে পুঁতে দিলাম আর একদিকে। তখন থেকে গতি পরিবর্তন করলে লতাটা। শুরু হলো নতুন দিকে পোঁতা কাঠিটার দিকে তার যাত্রা। এবং মোড় নিলে সে বেশ খানিকটা কোণ করে। বার কয়েক এই কাণ্ড করলাম এবং প্রতিবারই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দিক পরিবর্তন

করে কাঠিটার দিকে ধেয়ে চলল লতাটা। শেষকালে যেন হতাশ হয়েই হাল ছেড়ে কাছাকাছি একটা ছোট্ট গাছের দিকে এগিয়ে গেল বেচারী। কয়েকবার লোভ দেখালাম। এবারে কিন্তু আর প্রলোভনে ভুলল না সে। সোজা এগিয়ে গিয়ে গাছটাকে আশ্রয় করে জড়িয়ে উঠল ওপর দিকে।

"জলকণার সন্ধানে অবিশ্বাস্যভাবে দীর্ঘায়িত হয়ে চলে ইউক্যালিপ-টাসের শেকড়। একজন নাম-করা হর্টিকালচারালিষ্টের কাছে অদ্ভুত একটা গল্প শুনেছিলাম। ইউক্যালিপটাসের একটা শেকড় একটা পুরোনো ড্রেনের পাইপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর এগিয়ে চলে পাইপ বরাবর। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সামনে বাধা পায় একটা পাথরের দেওয়ালে। পাইপের খানিকটা সরিয়ে ফেলে দেওয়ালটাকে গাঁথা হয়েছিল সে জায়গায়। ড্রেন ছেড়ে দেওয়াল ধরে এগিয়ে চলল শেকড়টা এবং যতক্ষণ না একটা ফাঁক পাওয়া গেল, ততক্ষণ গতি পরিবর্তন করলে না। এই জায়গায় একটা পাথর খসে পড়ে গেছিল। ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে দেওয়ালের ওদিকে পৌঁছে গেল শেকড়টা। তারপর আবার ফিরে এল ড্রেনে এবং অদেখা অংশটায় ঢুকে পড়ে আবার শুরু হলো তার পাইপ-অভিযান।"

"এত কথার অর্থ?"

"তাৎপর্যটা কি ধরতে পারলে না? গাছেরও যে চেতনা আছে, তাই তো প্রমাণিত হয় এ থেকে! প্রমাণিত হয় যে তারাও ভাবে।"

"ধরে নেওয়া গেল, হ্যাঁ ভাবে। কিন্তু তারপর? আমাদের আলোচনা হচ্ছিল মেশিন সম্বন্ধে, গাছপালা সম্পর্কে নয়। মেশিনের খানিক খানিক অংশ কাঠ দিয়ে তৈরী হলেও হতে পারে এবং সে সব কাঠের মধ্যে যে প্রাণের ছিটেফোঁটাও থাকে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে, অধিকাংশ মেশিনই তৈরী হয় পুরোপুরি ধাতু দিয়ে। খনিজ জগতেও চিন্তার নজির দেখা যায় না কি?"

"Crystallization অর্থাৎ কেলাসন, মানে, খনিজ পদার্থের দানা-বাঁধা রহস্যের ব্যাখ্যা কি করে করবে শুনি ?"

"আমার কোন ব্যাখ্যাই নেই এবং তা করারও চেষ্টা করি না।"

"তার কারণ, কৃষ্ট্যালের উপাদান মৌলিক পদার্থগুলোর মধ্যে যে আত্যন্তিক বুদ্ধিদীপ্ত সহযোগিতা, তা না স্বীকার করে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তাই সে চেষ্টা কর না। সিপাইরা যখন সারি বেঁধে দাঁড়ায় বা চার কোণা ব্লকের সৃষ্টি করে, তখন বলো যে এর পেছনে আছে যুক্তি। বুনো-হাঁসের দল উড়ে চলার সময়ে যখন V অক্ষরের আকারে নিজেদের সাজিয়ে নেয় তখন বলো সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু যখন একটা খনিজ পদার্থের সমধর্মসম্পন্ন অ্যাটমগুলো সলিউশনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনভাবে এগুতে এগুতে গাণিতিকভাবে বিভিন্ন আকারে সাজিয়ে নেয় নিজেদের অথবা জমে যাওয়া জলকণা সুষ্ঠু, সুন্দর, সুডৌল তুষার কণিকার আকার ধারণ করে, তখন আর তোমাদের মুখে কোন কথা সরে না। এই জাতীয় আশ্চর্য অযুক্তির কোন বিশেষ নাম আবিষ্কার করাও তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি আজ পর্যন্ত।"

দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কল্যাণাক্ষ। নিগূঢ় তন্ময়তার অস্বচ্ছ আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ওর সজীব, সতেজ, প্রাণোচ্ছল মূর্তি। প্রতিটি কথার মধ্যে যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছিল বিষয়বস্তুর প্রতি ওর আত্যন্তিক আগ্রহ আর সুগভীর প্রজ্ঞা। ওর কথা ফুরোতে না ফুরোতেই স্পষ্ট শুনলাম পাশের ঘরে আশ্চর্য রকমের কয়েকটা দুম দুম শব্দ। কে যেন ঘুষির পর ঘুষি মেরে চলেছে টেবিলের ওপর। পাশের ঘরটাই কল্যাণাক্ষের মেশিন-শপ। সে ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির প্রবেশাধিকার নেই এ কারখানায়। শব্দটা কানে আসামাত্র উদ্বিগ্ন মুখে সাঁৎ করে কারখানা ঘরে ঢুকে গেল ও। ও ঘরে যে কেউ থাকতে পারে, এমন ধারণা এতক্ষণ আমার আসে নি। কল্যাণাক্ষের ঐ রকম হন্তদন্ত হয়ে ঢোকার বহর দেখে প্রবল কৌতুহল হলো আড়ি পেতে শোনার। চাবির দরজায় চোখ রাখি নি এবং সে

জন্যে আজও নিজেকেই নিজে ধন্যবাদ জানাই। এলোমেলো উদ্ভট কতকগুলো শব্দ ভেসে এল। অনেকটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দের মত। থর থর করে কেঁপে উঠল ঘরের মেঝে। পরিষ্কার শুনলাম ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ এবং ভাঙা ভাঙা গলায় কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল, "গোল্লায় যাও!" তারপরেই সব চুপ। একটু পরেই বেরিয়ে এল কল্যাণাক্ষ।

শুকনো হাসি হেসে বললে, "হুট্ করে তোমাকে একলা ফেলে যাওয়ার জন্যে কিছু মনে করো না। কোন কাজকর্ম না দিয়েই একটা মেশিন ফেলে এসেছিলাম ও ঘরে। তাই মেজাজ খিঁচরে গেছিল বেচারার।"

আমি অপলকে তাকিয়েছিলাম কল্যাণাক্ষের ডান গালের পানে। সমান্তরাল চারটে আঁচড় দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছিল।

চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, "মেশিনটার নখগুলো ছেঁটে দিলে কেমন হয়!"

এ পরিহাস না করলেও চলত। কল্যাণাক্ষ কিন্তু কর্ণপাত করল না এ বিদ্রূপে। চেয়ারাটা টেনে নিয়ে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে ছেড়ে যাওয়া কথার খেই তুলে নিয়ে আবার শুরু করল তার বক্তিমে।

"এমন অনেক বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন বস্তু মাত্রই সচেতন। পড়া শুনো তো তোমার বড় কম নয় হে, সুতরাং তাঁদের নাম করতে চাই না আর তোমার কাছে। এঁদের সঙ্গে তোমার মতের যে তিলমাত্র মিল নেই, তা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। এঁরা মনে করেন প্রতিটি অ্যাটমের আছে বোধশক্তি, আছে প্রাণের ইঙ্গিত, আছে চেতনার স্পন্দন। আমিও তাই মনে করি। নির্জীব, নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ বলে কিছু ইহজগতে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। প্রত্যেকেই জীবন্ত, প্রত্যেকের মধ্যে আছে শক্তির সহজাত স্ফুরণ। আশপাশের সঙ্গে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সংযোগ আছে। উন্নততর প্রাণীর বুদ্ধি প্রাখর্যের কাছে তারাও নতি স্বীকার করে, তাদের

আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না। তাই তো দেখি মানুষ তার খুশীমত বিশেষ বিশেষ ধর্মকে করায়ত্ত করে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র সব মেশিন। একটা সম্পূর্ণ মেশিনের মধ্যে যে জটিলতা থাকে, সে জটিলতার অন্তরালে নিহিত থাকে যতখানি ধীশক্তি আর উদ্দেশ্য, তারও কিছু কিছু প্রতিটি অ্যাটমের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

"হারবার্ট স্পেন্সারের 'জীবন'-এর সংজ্ঞা মনে পড়ে তোমার! তিরিশ বছর আগে এ সংজ্ঞা পড়েছিলাম আমি। পরে তার কোন পরিবর্তন সাধন হয়েছিল কি না তা আমার জানা নেই। হলেও হতে পারে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, আজ পর্যন্ত এমন একটা শব্দও আমার মাথায় আসে নি যা ঐ সংজ্ঞার যে কোন শব্দের চাইতে বেশী উপযুক্ত হতে পারে। অনেক ভেবেও এমন কোন শব্দ আমি মনে করতে পারি নি, যার স্থান হতে পারে ঐ সংজ্ঞার মধ্যে। 'জীবন' কি, সে সম্বন্ধে এর চাইতে ভাল সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত আমি আর পাই নি। শুধু সব চাইতে সেরা নয়, হারবার্ট স্পেন্সারের এই সংজ্ঞাই হলো 'জীবন'-এর একমাত্র সম্ভাব্য সংজ্ঞা।

"তিনি বলেছেন, 'জীবন' মানেই হলো কতকগুলো বহুধর্মী পরিবর্তনের নিশ্চিত সমন্বয়। এ পরিবর্তন বহিস্থ সমাবস্থান আর অনুক্রমের সঙ্গে তাল রেখে কখনও যুগপৎ, আবার কখনও বা ক্রমান্বয়।"

আমি বললাম, "এটা গেল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির ব্যাখ্যা। কিন্তু কারণ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত এর মধ্যে নেই।"

ও বললে "এ সংজ্ঞায় এর চাইতে বেশী আর কিছু বলা সম্ভব নয়। মিল কি বলেছেন জানো তো? পূর্ববর্তী ঘটনা ছাড়া কারণ জানা অথবা ফলাফল ছাড়া প্রতিক্রিয়া জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কতকগুলো ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিভিন্নধর্মী হলেও একটা ছাড়া আর একটাকে ঘটতে দেখা যায় না। সময়ের দিক দিয়ে বিচার করে প্রথমটিকে বলি কারণ; দ্বিতীয়টিকে বলি প্রতিক্রিয়া। খরগোসকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুকুর, এ দৃশ্য যিনি অনেকবার দেখেছেন, কিন্তু

কুকুরকে খরগোস তাড়িয়ে নিয়ে যেতে কস্মিনকালে দেখেন নি, তিনি খরগোসটাকে কুকুরের কারণ হিসেবে ধরে নিলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।”

হাসতে হাসতে আবার বললে ও, “আমার খরগোস হয়ত যুক্তিবদ্ধ তর্কের সড়ক থেকে অনেক দূরে টেনে এনেছে আমায়। কিন্তু এরকম পিছু নেওয়াতেও আনন্দ আছে, নাকি বল? আমি যা বলতে চাই, তা হলো এই—হারবার্ট স্পেন্সারের ‘জীবন’-এর ব্যাখ্যার মধ্যে মেশিনের তৎপরতারও স্থান আছে। অর্থাৎ সংজ্ঞাটায় এমন কিছু নেই যা মেশিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পর্যবেক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী আর চিন্তাশীল পুরুষদের মধ্যে প্রগাঢ় যাঁর প্রজ্ঞা, সেই হারবার্ট স্পেন্সারের মতে তৎপর থাকাকালীন সময়টুকুর মধ্যে মানুষ যেমন সজীব, ঠিক তেমনি মেশিন যতক্ষণ চালু থাকে, ততক্ষণ সে-ও জীবন্ত। বিজ্ঞানী জগদীশ বোসও দেখিয়ে গেছেন, একনাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ কাজ করার পর ধাতুও মানুষের মত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হরেকরকম মেশিনের আবিষ্কর্তা আর নির্মাতা হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে এসব তথ্যের মধ্যে এতটুকু অসত্য নেই!”

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল কল্যাণাক্ষ। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল টেবিলের ওপর এলোপাতাড়িভাবে সাজানো তাসগুলোর দিকে। দেরী হয়ে যাচ্ছিল। ভাবলাম, এইবার ওঠা যাক কিন্তু তবুও ওকে এইভাবে নিরালা নির্জন বাড়ীতে একলাটি ছেড়ে যেতে মন সরলো না আমার। একলাটিই বা বলি কি করে? পাশের ঘরে যে লোকটা ঘাপটি মেরে রয়েছে, তার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আর কিছু না জানলেও একটা জিনিষ অনুমান করতে মোটেই বেগ পেতে হয় নি আমায়। লোকটার সঙ্গে কল্যাণাক্ষর বিশেষ সদ্ভাব নেই এবং তার স্বভাবটিও বড় হিংস্র আর নিষ্ঠুর। ওর দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে চোখের ওপর চোখ রেখে কারখানাঘরের দরজাটা দেখিয়ে ফিস ফিস করে শুধোলাম আমিঃ

“কল্যাণাক্ষ, ও ঘরে কাকে লুকিয়ে রেখেছ?”

অবাক হয়ে গেলাম ওর হাসি দেখে। লঘুভাবে হেসে ফেলল ও। কোনরকম দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলে :

"কাউকে নয়! যে কাণ্ডটা নিয়ে এখনও মনে মনে তোলাপাড় করছ তুমি, তার জন্যে আমিই দায়ী। একটা মেশিনকে কোনরকম কাজ না দিয়ে তোমার অজ্ঞতা দূর করার জন্যে লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়ছিলাম কিনা, তাই। 'চেতনা' যে 'ছন্দে'র সৃষ্টি, তা জানার সৌভাগ্য কি তোমার কোনদিন হয়েছে?"

"চুলোয় যাক তোমার চেতনা আর ছন্দ," উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম আমি। "আর নয়, এবার চলি। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। যে মেশিন টাকে ও ঘরে ফেলে এসেছিলে, পরের বার যখন তাকে থামানো দরকার মনে করবে, তখন যেন একজোড়া দস্তানা পরিয়ে নেওয়া হয় তার হাতে।"

আমার বাক্যবাণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য না করেই তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি।

রিম-ঝিম রিম-ঝিম বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছিল। আর সে কি কুচকুচে কালো আবলুষ কাঠের মত নিকষ অন্ধকার। জনহীন পথের দু'পাশে অনেক দূরে দূরে টিম টিম করে জ্বলছিল গ্যাসের বাতি। অন্ধকারের জঠর ভরাবার পক্ষে সে আলো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আর পেছনে নিবিড় তমিস্রার মধ্যে ভেসে ছিল শুধু একটা চৌকোণা আলো—কল্যাণাক্ষের 'মেশিন-শপে'র পর্দাবিহীন জানলা। আর সবক'টা জানলাতেই ঝুলছে পর্দার অনুশাসন. শুধু এই জানলাটাই কোনগতিকে থেকে গেছে অনাবৃত। ধাতব-চেতনা সম্পর্কে আমার শিক্ষক হিসেবে আর ছন্দের জনক হিসেবে ও যে আবার শুরু করেছে অধ্যয়ন কার্য, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না আমার মনে। আমি এসে পড়ায় বাধা পড়েছিল ওর সে পড়াশুনোয়। তখন ওর উদ্ভট কথাবার্তা শুনে বিস্তর কৌতুক অনুভব করলেও একটা জিনিষ আমি কিন্তু মোটেই মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। ওর মন, চরিত্র,

এমন কি ওর অদৃষ্টকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে ওর এই আপাতত অসংলগ্ন চিন্তাধারা। বড় দুঃখময় এই সম্পর্ক। অবশ্য এসব চিন্তাধারা যে বিকৃত মস্তিষ্কের বিদঘুটে উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছু নয়, এরকম একটা ক্ষীণ আশঙ্কাও অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল মনের কন্দরে। কিন্তু আশ্চর্য, যতই বিকৃত আর উদ্ভট হোক না কেন ওর বক্তিমে, ওর বাচনভঙ্গী কিন্তু অদ্ভুত রকমের যুক্তিনিষ্ঠ। বারবার ওর শেষ কথাটা ফিরে আসছিল আমার মনে 'চেতনা' যে 'ছন্দে'র সৃষ্টি, তা জানার সৌভাগ্য কি তোমার কোনদিন হয়েছে? সাদাসিধে হলেও কথাটার মধ্যে অসীম প্রলোভনের সন্ধান পেলাম। যতবার তা ফিরে এল মনের মধ্যে ততবারই ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার অন্তর্নিহিত অর্থ, প্রকট হয়ে উঠতে লাগল প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু। আমার তো মনে হলো এই কথাটার বনিয়াদের ওপরেই একটা দর্শন খাড়া করে ফেলা যায়। চেতনা যদি ছন্দ থেকেই উৎপন্ন হয়, তাহলে প্রত্যেকটা বস্তুই তো সচেতন; কেননা, প্রত্যেকেরই গতি আছে এবং সব গতিই তো ছন্দময়। চিন্তাধারার এই তাৎপর্য আর গভীরতা কল্যাণাক্ষ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারলাম না। আমি কিন্তু এই অচিন্তিতপূর্ব সত্যের অপরিসীম ব্যাপ্তি উপলব্ধি করে অভিভূত হয়ে পড়লাম। ও কি শুধুই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কৃচ্ছ্রসাধনের মার্গ পেরিয়ে উপনীত হয়েছে এই দার্শনিক বিশ্বাসে?

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পরেও কল্যাণাক্ষ আমায় যা বিশ্বাস করাতে পারেনি, আচম্বিতে সেই বৃষ্টি-মুখর রাতে ক্ষণেকের চিন্তায় তা বিদ্যুদ্দামের মতই উদ্ভাসিত করে তুলল আমার মনের দিক হতে দিগন্ত। অভিনব এই উপলব্ধি। তুফান-প্রকম্পিত তমিস্রা-মগ্ন সেই নিঃসঙ্গ রাতে নতুন করে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করলাম 'দার্শনিক চিন্তাধারার সীমাহীন বৈচিত্র্য আর উত্তেজনা'। নতুন প্রজ্ঞার উপলব্ধি আর যুক্তিবোধের অহমিকায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম আমি। মনে হলো, যেন মাটিতে পা পড়ছে না, যেন কোন অদৃশ্য ডানাযুগল আমাকেশূন্যে

তুলে নিয়ে ধেয়ে চলেছে পবনবেগে।

যে মানুষটিকে আমার গুরু আর পথপ্রদর্শক বলে হঠাৎ চিনতে পারলাম, প্রবল ইচ্ছে হলো আবার তার কাছে ফিরে গিয়ে আরও আলোর সন্ধান নেওয়ার। অজানিতেই পেছন ফিরে এবং তা বোঝবার আগেই আচমকা দেখলাম কল্যাণাক্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি আমি। বৃষ্টির জলে ভিজে সপ্ সপে হয়ে উঠলেও মোটেই অস্বচ্ছন্দ বোধ করলাম না। উত্তেজনার চোটে দরজার ঘণ্টা খুঁজে না পেয়ে ঠেলা মারতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম বসবার ঘরে। এই ঘর থেকেই একটু আগে বিদায় নিয়েছিলাম আমি। চারদিক অন্ধকার আর নিস্তব্ধ। কল্যাণাক্ষ নিশ্চয় পাশের 'মেশিন-শপে' সেঁধিয়েছিল। দেওয়াল ধরে ধরে এগিয়ে গিয়ে মাঝের দরজাটার সামনে পৌঁছলাম। তারপর বেশ জোরে জোরে পর পর কয়েকবার টোকা মারলাম। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ ভেসে এল না ভেতর থেকে। কল্যাণাক্ষ নিশ্চয় শুনতে পায় নি। পাওয়াও সম্ভব ছিল না। কেননা, ঝড়ো বাতাস আর তুমুল বৃষ্টি প্রবলবেগে আছড়ে পড়ছিল দেওয়াল আর দরজা জানলার ওপর। প্রকৃতির সে নিষ্ঠুর আক্রমণে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছিল ছাদ, আর তারই গুম গুম শব্দ প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছিল ফাঁকা ঘরের মধ্যে।

মেশিন-শপের মধ্যে কোনদিন আমায় আমন্ত্রণ জানায় নি কল্যাণাক্ষ। আমন্ত্রণ তো দূরের কথা, আমাদের কারোরই প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে—শুধু একজন ছাড়া। পাকা ধাতুর কারিগর সে। তার নাম ভৈরব. আর স্বভাব অল্প কথা বলা—এ ছাড়া লোকটি সম্বন্ধে আর কেউই কোন খবর রাখত না। কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় আমার তখন এমনই অবস্থা যে আদব-কায়দা, বিধিনিষেধ আর কিছুই মনে ছিল না। কাজেই, সাড়া না পেয়ে খুলে ফেললাম দরজা। ঘরের মধ্যে যে দৃশ্য দেখলাম, তা দেখামাত্র দেখতে দেখতে তিরোহিত

হলো আমার যাবতীয় দার্শনিক ভবিষ্যদ্‌বাণী।

ছোট্ট একটা টেবিল। একদিকে আমার পানে মুখ করে বসে কল্যাণাক্ষ। একটি মাত্র মোমবাতি জ্বলছে টেবিলের ওপর। এবং এই মোমবাতির আলো ছাড়া ঘরের মধ্যে আর দ্বিতীয় আলো নেই। ওর ঠিক বিপরীত দিকে, আমার দিকে পেছন ফিরে বসে আর একজন লোক। দু'জনের মধ্যে টেবিলের ওপর রয়েছে একটা দাবার ছক। দেখেই বোঝা যায় দু'জনে খেলায় মেতে উঠেছে। দাবা খেলা আমি সামান্যই জানি। কিন্তু ছকের ওপর মাত্র কয়েকটা ঘুঁটি পড়ে থাকতে দেখে বুঝলাম খেলা শেষ হয়ে এল বলে। তন্ময় হয়ে গেছিল কল্যাণাক্ষ, নিবিড়তম আগ্রহের দ্যুতি থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল ওর দুই চোখে। কিন্তু আমার মনে হলো, ওর এই নিঃসীম আগ্রহ উৎকণ্ঠা ব্যগ্রতা খেলার সম্বন্ধে যত না তার চেয়েও যেন অনেক বেশী প্রতিপক্ষ সম্পর্কে। কেননা, বড় বড় চোখে এমনভাবে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল কল্যাণাক্ষ যে তার দৃষ্টিরেখার আর একপ্রান্তে দোরগোড়ায় আমি দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আমাকে দেখতে পেল না সে। পাণ্ডাসপানা নিরক্ত সাদা হয়ে উঠেছিল ওর মুখ, বীভৎস রকমের ফ্যাকাশে সে মুখচ্ছবি দেখলে আজানিতেই শিউরে উঠতে হয়। দুই চোখ দুটুকরো হীরের মত জ্বলছিল দপ্‌ দপ্‌ করে। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের শুধু পেছনটাই আমার চোখে পড়ল এবং তাই যথেষ্ট। তার মুখ দেখার কোন স্পৃহাই জাগ্রত হলো না আমার মনে।

লোকটা উচ্চতায় পাঁচ ফুটের বেশী বলে মনে হলো না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশালাকৃতি দেখলে গরিলার কথা মনে পড়ে যায়। বেজায় চওড়া অতিকায় এক জোড়া কাঁধ; মোটা আর খাটো ঘাড়; বিশাল, চারকোণা মাথা—গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের ওপর টকটকে লাল রঙের একটা ফেজটুপী! পরণে ঠিক ঐ রকম রক্তরঙের একটা ঢলঢলে আলখাল্লা। কোমরের কাছে বেল্ট দিয়ে বাঁধা। লোকটা বসেছিল একটা বাক্সের ওপর, তাই পা দেখা যাচ্ছিল না। বাঁ হাতটা মনে

হলো কোলের ওপর রাখা—চাল দিচ্ছিল ডান হাত দিয়ে এবং অস্বাভাবিক রকমের লম্বা সে হাত—বেমানান, বেয়াড়া।

পিছু হটে এসেছিলাম আমি। এখন দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার আড়ালে ছায়াঘন জায়গাটিতে। এদিকে তাকালে দরজাটাকে শুধু খোলা দেখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেত না কল্যাণাক্ষ। কিন্তু প্রতিপক্ষের মুখ না দেখে তার কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার দিকে তাকানোর মত কোন লক্ষণ দেখলাম না ওর মধ্যে। কিসের তর্জনীহেলনে আমি ঢুকতেও পারলাম না, যেতেও পারলাম না। কি জানি কেন বিচিত্র একটা অনুভূতি জেগে উঠল আমার ভয়-ভয় মনের কোণে। মনে হলো, এখুনি যেন একটা ভয়াবহ বিয়োগান্তক দৃশ্য অভিনীত হবে এ ঘরের মধ্যে। দূরায়ত বিপদের দ্রিমি দ্রিমি ডম্বরুধ্বনি যেন শুনতে পেলাম কি এক আশ্চর্য অননুভূত পূর্ব উপায়ে। মনে হলো, সে বিপদে বন্ধুকে সাহায্য করার জন্যে আমার থাকা একান্তই দরকার। তাই, চোরের মত ঘাপটি মেরে দেখার মত অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিজয়কেতন উড়িয়ে দুরু দুরু বুকে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি দরজার আড়ালে!

দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছিল খেলার গতি। চাল দেওয়ার সময় ছকের দিকে কল্যাণাক্ষ প্রায় তাকাচ্ছিল না বললেই চলে। আমার আনাড়ি চোখে মনে হলো, ও যেন সবচেয়ে হাতের কাছে থাকা ঘুঁটিটাকেই নার্ভাসভাবে অস্থির, চঞ্চল, চকিত হাতে সরিয়ে দিচ্ছে। ওর প্রতিপক্ষের দিক থেকেও সাড়া আসছে তৎক্ষণাৎ! কিন্তু তার হাত নাড়ার ভঙ্গিমাটাই কেমন জানি মন্থর, একঘেয়ে আর বৈচিত্র্যবিহীন! বার বার সেই একই রকমের যন্ত্রসুলভ হাতনাড়া দেখে আমারও সহিষ্ণুতা ফুরিয়ে আসে। লোকটার সব কিছুর মধ্যেই কি এক অপার্থিব রহস্যের ছোঁয়া রয়েছে। ভেতরে ভেতরে থর থর করে কেঁপে উঠি আমি। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে কপালে।

দু'বার কি তিনবার ঘুঁটি সরানোর পর সামান্য মাথা হেলালে

আগন্তুক। এবং প্রতিবারই লক্ষ্য করলাম রাজাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কল্যাণাক্ষ। তারপরেই, আচমকা সহস্র বিদ্যুৎ-চমকের মতই সত্যের আলোয় নিমেষ মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মস্তিষ্কের অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রে-সেল। লোকটা বোবা। এবং সে একটা মেশিন—স্বয়ংক্রিয় দাবা-খেলোয়াড়! তখনই মনে পড়ল কল্যাণাক্ষ একবার আমার কাছে গল্প করেছিল বটে—এরকম ধরনের একটা যন্ত্র নাকি সে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু সে যে সত্যিই তা তৈরী করে ফেলেছে, তা আমি ভাবতেই পারি নি। মেশিনের চেতনা আর ধীশক্তি নিয়ে এত লম্বা বক্তৃতার অর্থ কি তাহলে পরিশেষে এই বিচিত্র যন্ত্র দেখিয়ে আমাকে তাক লাগিয়ে দেওয়া। এত কথা কি তাহলে সবই নিছক ভূমিকা। মেশিনটার যান্ত্রিক কল কৌশলের প্রতিক্রিয়া যাতে আমার ওপর আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে, তা দেখার জন্যেই কি আমাকে এ রহস্যের অন্ধকারে রেখে দেওয়ার এত প্রচেষ্টা!

'দার্শনিক চিন্তাধারার সীমাহীন বৈচিত্র্য আর উত্তেজনা' তখন অন্তে পৌঁচেছে! বিরক্ত হয়ে ফিরতে যাচ্ছি, ঠিক এমনি সময়ে এমন একটা কাণ্ড ঘটল যে নিমেষের মধ্যে আবার চন্‌মনে হয়ে উঠল আমার কৌতূহল। আচম্বিতে সামনের বিশালবপু বস্তুটাকে তার অতিকায় দুই কাঁধ ঝাঁকাতে লক্ষ্য করলাম। এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকানি দিলে যেন মেজাজ খিঁচড়ে গেছে তার। ব্যাপারটা এমনই মানবোচিত আর এতই স্বাভাবিক যে জড়পদার্থ সম্বন্ধে তুচ্ছ জ্ঞানলাভ সত্ত্বেও রীতিমত আঁতকে উঠলাম। শুধু তাই নয়, মুহূর্তেক পরেই মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত দিয়ে সজোরে দমাদম শব্দে টেবিলের ওপর কয়েকটা ঘুষি মারলে সে। কল্যাণাক্ষ তো তাই দেখে যেন আরও ঘাবড়ে গেল, আরও ফ্যাকাশে হয়ে উঠল তার ছাই-ছাই মুখ। নিদারুণ ভয় পেয়ে চট করে চেয়ারটাকে একটু পিছিয়ে নিতেও দেখলাম তাকে।

এবার কল্যাণাক্ষের চাল দেওয়ার পালা। এক হাত মাথার একদম ওপরে তুলল সে। তারপর, নিরীহ চড়ুইয়ের ওপর যেমন

ছোঁ মেরে পড়ে বাজপাখী, ঠিক তেমনিভাবে হঠাৎ হাত নামিয়ে এনে একটা ঘুঁটিকে চেপে ধরেই চীৎকার করে উঠল—'কিস্তি মাৎ'! সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল সে এবং চকিতে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল চেয়ারের পেছনে। নিশ্চল হয়ে বসে রইল যন্ত্র-মানুষটা।

বাতাসের জোর কমে এসেছিল, স্তিমিত হয়ে এসেছিল ঝড়ের প্রকোপ। কিন্তু সে জায়গায় ক্ষণে ক্ষণে অল্প বিরতি দিয়ে, গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি বেজে উঠছিল থমথমে আকাশের কোণে কোণে। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল মেঘের এই বুক-কাঁপানো দামামা-শব্দ। কিন্তু ঐ যে ক্ষণিক বিরতি, তার মাঝেই এবার আমি শুনতে পেলাম নতুন একটা আওয়াজ। ক্ষীণ গুন্ গুন একটা শব্দ—অনেকটা দূরায়ত মেঘমন্দ্রের মতই। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল শব্দটা. আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল একটা ঘরর ঘরর্ শব্দ। শব্দটার উৎপত্তি যে যন্ত্র-মানুষের দেহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না আমার। অনেকগুলো চাকা ঘুরলে যেরকম অদ্ভুত চাপা শব্দ হয়, এ যেন ঠিক তেমনি। শব্দটা শুনেই আমার মনে হলো যন্ত্রের ভেতরে কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কণ্ট্রোল-বোর্ডের আওতার বাইরে চলে গেছে যন্ত্রের একটা অংশ। দাঁতওয়ালা চাকার একটা দাঁত ভেঙে গেলে যেরকম কররর্ কররর্ শব্দ হয়—এ যেন ঠিক তেমনি। শব্দটার প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশী কিছু অনুমান করার আগেই যন্ত্রদানবটার অদ্ভুত রকমের অঙ্গভঙ্গি দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার আচমকা দানবটার প্রতিটি প্রত্যঙ্গে হাতে, মাথায়, দেহে, জেগে উঠল এক বিচিত্র কাঁপন। দেখতে দেখতে এ মৃদু কাঁপন পর্যবসিত হলো ভয়ংকর আক্ষেপে। দারুণ শীতে মানুষ যেমন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে অথবা আতীব্র বেদনায় দুমড়ে মুচড়ে উঠতে থাকে তার সর্বদেহ, হুবহু তেমনি ভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রচণ্ড হয়ে উঠতে লাগল দানবটার যান্ত্রিক খিঁচুনি। সমস্ত দেহটার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল ভয়াবহ উত্তেজনা। আচম্বিতে জ্যামুক্ত ধনুকের মত তড়াক করে লাফিয়ে

উঠেই সে ধেয়ে গেল সামনের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে ; জলের মধ্যে উঁচু থেকে ঝাঁপ দেওয়ার সময়ে সাঁতারুর মত ভঙ্গিমাতেই ছিটকে গেল সে সামনের দিকে। বন্দুকের গুলীর মত এমনই অসম্ভব দ্রুতগতিতে সামনে লাফিয়ে পড়ল যে আমার চোখও ব্যর্থ হলো তার গতিরেখা অনুসরণ করতে। কল্যাণাক্ষ লাফিয়ে ওর নাগালের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলে, কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছিল। পলক ফেলার আগেই সভয়ে লক্ষ্য করলাম বিকট বস্তুটার সাঁড়াশির মত হাত চেপে বসেছে কল্যাণাক্ষের গলায়! আর কল্যাণাক্ষ দুই হাত দিয়ে চেপে ধরেছে দানবটার কব্জিজোড়। তার পরেই উল্টে গেল টেবিলটা, মোমবাতিটি মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে একবার খাবি খেয়ে নিভে গেল, অন্ধকারের সমুদ্র চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে, চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল সব কিছু। কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম ধ্বস্তাধ্বস্তির ভয়ানক শব্দ এবং সব কিছু ছাড়িয়ে রুদ্ধশ্বাস কল্যাণাক্ষের গলার ঘড় ঘড় শব্দ—তার সাথে মিশে ছিল শ্বাস নেওয়ার আকুল প্রচেষ্টায় করুণ কুঁই কুঁই আওয়াজ। বীভৎস শব্দ লক্ষ্য করে অন্ধকারের মধ্যেই ধেয়ে গেলাম ঘরের মধ্যে অসহায় বন্ধুকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মাঝপথেই আচমকা সমস্ত ঘরটা চোখধাঁধানো ধবধবে সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং সে আলো আমার চোখের সুড়ঙ্গ বেয়ে মনের পটে যে দৃশ্যটির ছবি চিরতরে মুদ্রিত করে গেল, তা আর ইহজীবনে ভোলবার নয়। মেঝের ওপর দেখলাম দুই মল্লবীরকে। কল্যাণাক্ষ নীচে, আর তখনও দুই লৌহ-মুঠিতে ধরা রয়েছে তার গলা ; মাথাটা হেলে পড়েছে পেছন দিকে, দুই চোখ নিঃসীম আতঙ্কে ঠেলে বেরিয়ে আসছে ; হাঁ হয়ে গেল মুখবিবর আর অবশ হয়ে জীবটা ঝুলছে বাইরে ; আর—ওঃ, সে কি ভয়াবহ বৈসাদৃশ্য। তার বুকের ওপর বসা খুনে মেশিনটার রঙ দিয়ে আঁকা মুখে সুনিবিড় প্রশান্তি আর সুগভীর চিন্তার প্রতিচ্ছবি—যেন দাবা সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল! এইটুকু দেখার পরেই সব অন্ধকার হয়ে গেল,

হারিয়ে গেল নিতল নৈঃশব্দের অতলে।

তিনদিন পরে একটা হাসপতালে জ্ঞান ফিরে পেলাম আমি। আস্তে আস্তে মস্তিষ্ক সুস্থ হয়ে ওঠার সাথে সাথে ফিরে এল সেই ভয়ংকর রাতের স্মৃতি। কল্যাণাক্ষের একমাত্র অনুচর ভৈরবকে চিনতে পারলাম। ওর দিকে তাকাতেই একটু হাসল ও।

ক্ষীণস্বরে কোনরকমে বললাম আমি, "ভৈরববাবু, কি হয়েছিল, সব বলুন আমায়।"

"একটা জ্বলন্ত বাড়ীর ভেতর থেকে আপনাকে বাইরে আনা হয়েছে। বাড়ীটা আপনার বন্ধু কল্যাণক্ষেবাবুরা কি করে যে আপনি সেখানে গিয়ে পড়লেন, তা কেউ জানে না। আপনি ভাল হয়ে উঠলে আপনার মুখেই তা শোনা যাবে'খন। আগুন যে কি করে লাগল, তাও খুব রহস্যময়। আমার নিজের ধারণা, বাজ পড়েছিল বাড়ীর ওপর।"

"আর কল্যাণাক্ষ?"

"কাল দাহ করা হয়েছে তাঁকে—মানে, তাঁর শরীরের যেটুকু পাওয়া গেছে—সেইটুকুরই—"

মনে হলো স্বল্পভাষী হলেও অন্য সময়ে ভৈরবের পেট থেকে অনেক কথাই বার করা যাবে। অসুস্থ অবস্থায় আর কিছু শোনাও ঠিক নয়। বেশ কিছুক্ষণ তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করার পর কোনরকমে আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম আমি:

"আমাকে কে বাইরে নিয়ে এল?"

"তাই যদি শুনতে ইচ্ছে যায় তো শুনুন, আমিই বাঁচিয়েছি আপনাকে।"

"ধন্যবাদ ভৈরববাবু, ভগবান আপনার ভাল করবেন। আপনাদের দক্ষ হাতে গড়া সেই আশ্চর্য জিনিষটা, মানে, সৃষ্টিকর্তাকে যে নিজের

হাতে খুন করলে, সেই যন্ত্রদানব দাবা-খেলোয়াড়কেও বাঁচাতে পেরেছেন আপনি?”

আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ভৈরব। তারপর আবার ফিরে তাকালে আমার পানে। গম্ভীর মুখে বললে:

“আপনি তা জানেন?”

“জানি। আমি নিজের চোখে সব দেখেছি।”

এ ঘটনা ঘটেছিল অনেক বছর আগে। মৃত্যুর পদধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই লিখে গেলাম সেই কাহিনী।···
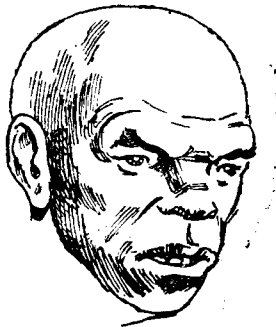
প্রলয় এনেছিল পারার ধূমকেতু

গভীর জঙ্গল। শ্বাপদসংকুল এ অরণ্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে কেউ চায় না, এক সৈন্যবাহিনী ছাড়া। নেফার পাহাড়ঘেরা এই অরণ্য অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে মিলিটারী। আকাশ থেকে দেখা যায় না গোপন বিমানঘাঁটির রানওয়ে। নিখুঁত ক্যামোফ্লেজ একেই বলে। কাছে এলে চোখে পড়ে বিমান দৌড়ানোর মসৃণ পথ। বিমান রাখবার হ্যাঙ্গার। সৈন্যশিবির। আরো কত কি।

পাণ্ডব-বর্জিত এই দেশে হিংস্র জানোয়ারে ভয় ছিল। শত্রুপক্ষের ভয় ছিল। কিন্তু ডানপিটে যোদ্ধারা ভয় পায় নি। লোহকঠিন স্নায়ু তাদের কোনদিন বিচলিত হয় নি! হল একদিন। ভয়ংকর সেই দিন! পৃথিবীর চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এল পৃথিবীর বাইরে থেকে— মহাশূন্য থেকে। কোটি কোটি মানুষ জানতেও পারল না কি নিষ্ঠুর নির্মম নিশ্চিহ্ন মৃত্যুর দিকে পলে পলে এগিয়ে চলেছে বিশ্ববাসী! সারা পৃথিবী যখন দৈনন্দিন কর্মসূচী নিয়ে মত্ত, তখন নেফার এই গহন অরণ্যে অভিনীত হল এক অবিশ্বাস্য নাটক।

অবিশ্বাস্য? হয়ত তাই। এখনো যখন সে কাহিনী ভাবি, মনে হয়, সত্যিই কি এ ঘটনা ঘটেছিল। সত্যিই কি মহাকাশ থেকে এসেছিল হুঁশিয়ার-বার্তা? মূর্তিমান প্রহেলিকার মত অরণ্য-শীর্ষে চক্রাকারে পাক খেয়েছিল নিঃশব্দগতি ফ্লাইং সসার? বিস্ময় জাগে। মনে হয়, সবই বুঝি অলীক। অলীক সেই শ্বাসরোধী মুহূর্তগুলি। অলীক তাদের আবির্ভাব। অলীক তাদের তিরোধান।

কিন্তু ছায়াপথের সেই ছবিটি তো অলীক নয়। লক্ষ কোটি তারকার অবস্থান-চিহ্নিত সেই ছবিটি তো মিথ্যা নয়। আমি যা দেখেছি, তা এ যুগের যে কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী না দেখেও হিসেব

কষে বার করতে পারে। কিন্তু আমি দেখেছি তা নিজের চোখে।

দশ হাজার বছর আগেকার এক লুপ্ত অতীতের কয়েকটি রহস্য-মানব এসে দেখিয়েছে ছায়াপথের সেই ছবি···দেখিয়েছে পারার ধূমকেতুর গতিপথ···

পারার ধূমকেতু? কাল্পনিক বলেই মনে হয় বটে। কিন্তু এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবই কি আর ধারণায় আনা যায়?—যায় না। আমরাও পারিনি পারার ধূমকেতুর সম্ভাবনাকে কল্পনায় আনতে। তাই শত-শতাব্দীর সর্বনাশ তখন আসন্ন, যখন সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ এই পৃথিবীর নিষ্প্রাণ হওয়ার আর বেশী দেরী নেই, ঠিক তখুনি দশ হাজার বছর আগেকার প্রেতমূর্তির মত তারা এসেছিল ফ্লাইং সসার নিয়ে···এসেছিল···আমাদের হুঁশিয়ার করেছিল···কিন্তু মূর্খ আমরা··· বন্ধুকে ভেবেছি শত্রু···হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও অবিশ্বাস করেছিলাম··· শত্রুপক্ষের চর ভেবেছিলাম···

তারপর? তার পরের ঘটনা আরও ভয়ংকর। কিন্তু গোড়া থেকেই শোনা যাক!

আগেই বলে রাখি, আমি সামরিক বিভাগের কেউ নই। আমি অ্যাসট্রো-ফিজিসিস্ট। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অসীম রহস্য আমাকে উন্মাদ করেছিল কলেজ-জীবন থেকেই। তাই জ্ঞানের সন্ধানে ছুটেছিলাম সুদূর মার্কিন দেশে। সেখানে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা সেরে যখন দেশে ফিরলাম, তখন আমার বয়স হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা এতটুকু কমেনি—বরং বেড়েছে। বিশ্বরহস্য তার সীমাহীন অঙ্গন মেলে ধরেছে আমার অবাক চোখের সামনে। আমি অন্তরের অশান্তি নিয়ে ছটফট করছি! আরও জানতে চাইছি। চাঁদ ছাড়িয়ে, মঙ্গল ছাড়িয়ে, শুক্র ছাড়িয়ে, সৌরজগৎ ছাড়িয়ে ছায়াপথের দূর দূর গ্রহে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে কিনা জানতে চাইছি। অথচ পারছি না। জ্ঞান-তৃষ্ণার এ জ্বালা যে না সয়েছে, সে বুঝবে না।

আমি যেন সত্যিই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম।

এই সময়ে ফ্লাইং সসারের ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটতে লাগল ভারতের আকাশে। বিশেষ করে নেফার এই অঞ্চলে রহস্যময় উড়ন্ত চাকতিকে নক্ষত্রবেগে উড়তে দেখল অনেকে। কেউ আতংকিত হল। কেউ কৌতূহলী হল। আমি হয়ে উঠলাম চঞ্চল।

সামরিকবাহিনী কিন্তু সতর্ক হল! শত্রুপক্ষের নয়া কৌশল কিনা কে জানে! উড়ন্ত চাকতির ছদ্মবেশে নতুন ধরনের বিমান হয়ত টহল দিচ্ছে—দেশের সামরিক খুঁটিনাটির ছবি তুলে পগার-পার হচ্ছে। তাই ওরা হুঁশিয়ার হল।

নেফায় আমি এসেছিলাম এই কারণেই। বিজ্ঞানীমহলে আমি পরিচিত। কিন্তু সামরিকমহলেও যে আমার নাম আগ্রহের সঞ্চার করেছে, তা জানলাম নেফায় এসে। মিলিটারী বেসের এক হোমরাচোমরা অফিসার আমাকে বিলক্ষণ খাতির করলেন এবং তাঁর ডেরায় আমাকে থাকতে বাধ্য করলেন।

দিন সাতেকের মধ্যেই সেই উড়ন্ত রহস্যকে দেখা গেল। রাতের আঁধারে নয়, গোধূলির ছায়ামায়ায় নয়, মধ্যাহ্নের ঝলমলে আলোয় আবির্ভূত হল সেই প্রহেলিকা। আচম্বিতে সাইরেনের বিকট শব্দে আমরা চমকে উঠেছি। শত্রুপক্ষের বিমান নাকি? হন্তদন্ত হয়ে শিবির ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। তারপর স্তম্ভিত হয়ে গেছি শূন্যে ভাসমান বিচিত্র যন্ত্রটিকে দেখে।

ফ্লাইং সসার! নিঃসন্দেহে উড়ন্ত পিরিচ! অবিকল চায়ের পিরিচের মতই গোলাকার গড়ন। পিরিচের ওপর যেন উপুড় করা একটা বাটি। সেটাই উড়ন্ত যন্ত্রযানের ককপিট—কন্ট্রোল কেবিন। সূর্যালোকে ঝলমল করছে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়! প্ল্যানেটেরিয়ামের মত বিশাল গম্বুজে বহু গবাক্ষ। কাঁচের মত স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে আবৃত। কয়েকটি গবাক্ষ দিয়ে একই সঙ্গে ঘন নীল ও গাঢ় লাল দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আলোগুলো জ্বলছে আর নিবছে। কিসের সংকেত করছে যেন।

ফ্লাইং সসার এতদিন সবাই দেখেছে বিদ্যুৎরেখার মত চকিতে আকাশের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে অপসৃত হয়েছে। তাই কতই না জল্পনাকল্পনা হয়েছে।

কিন্তু এ কি কাণ্ড! উড়ন্ত পিরিচ তো ছুটছে না! অবিশ্বাস্য বেগে মেঘের আড়ালে সে তো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে না! সাইরেনের বিকট কান্নায় কর্ণ বধির হবার উপক্রম; অথচ উড়ন্ত পিরিচের রহস্য-চালকরা তো ভয় পাচ্ছে না—শিউরে উঠে চম্পট দিচ্ছে না!

বিমানঘাঁটির বেতারে এবার শোনা গেল এক অদ্ভুত সংকেত—কারা যেন বিপদে পড়েছে···সাহায্য চাইছে··মানুষের শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে··হুঁশিয়ার হতে বলছে। কিন্তু সংকেত-ভাষা ধরেও ধরা যাচ্ছে না।

সামরিক কর্তারা প্রমাদ গণলেন। বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো প্রস্তুত হয়ে রইল। হুকুম পেলেই শুরু হবে বোমাবর্ষণ। বিশ্বাস নেই—কাউকে বিশ্বাস নেই! কে জানে, উড়ন্ত পিরিচের ছদ্মবেশে প্রলয় ঘনিয়ে এসেছে কিনা!

সহসা উড়ন্ত পিরিচ দুলে উঠল। এতক্ষণ যা স্থির হয়ে ভাসছিল প্রখর সূর্যালোকে, আচম্বিতে তা দুলে উঠেই নামতে শুরু করল। নিঃশব্দে কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে বিচিত্র আকাশযানের সেই অবতরণ-পর্ব দেখে আঁতকে উঠল মিলিটারী। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল!

অবতরণ-ক্ষেত্রের ঠিক কেন্দ্রে নেমে পড়ল ফ্লাইং সসার। দেখে মনে হয়, যেন একটা অতিকায় বোতল অথবা কুমোরের চড়কা। ভূমি স্পর্শ করতে না করতেই অটোমেটিক বন্দুক হাতে ঘিরে ধরল শান্ত্রীরা। বেচাল দেখলেই গুলি চালাবে। শত্রুর কারসাজি কত রকমের হতে পারে। কিন্তু নষ্টামি করে চম্পট দেওয়ার সব পথই বন্ধ! নিমেষে যন্ত্রযানকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য জোড়া জোড়া আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত।

সহসা ফ্লাইং সসারের নিচের একটা ঢাকনি খুলে গেল। একটা ধাতুর মই নেমে এল। মইয়ের ধাপে পা দিয়ে নেমে এল দুটি মূর্তি।

দুটি মনুষ্যমূর্তি !

এ কী রহস্য ! অন্য গ্রহের জীব কি তবে মানুষের মতই দেখতে ? দিব্যি লম্বা-চওড়া দুটি পুরুষমূর্তি হন হন করে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্য অন্য রকমের। মুখে তাদের হাসি। দুই হাত সামনে প্রসারিত।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সৈন্যবাহিনী। আমিও হতভম্ব। দুরু দুরু বুকে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম সৃষ্টিছাড়া জীবদের দেখব বলে। না জানি কি বীভৎস তাদের গড়ণ হবে, কি বিকট তাদের মুখশ্রী হবে! সিনেমায়, গল্পে গ্রহান্তরবাসীর চেহারার কত বর্ণনাই না পেয়েছি। কিন্তু কি আশ্চর্য ! এরা তো দেখছি মানুষ !

আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল বিচিত্র পোশাকধারী দুই মূর্তি। হ্যাঁ, অবিকল মানুষ। দুই চোখে গভীর দৃষ্টি—শান্ত, সুন্দর, কিন্তু যেন কিছুটা উদ্বিগ্ন।

আচমকা কথা বলল ওরা। চমকে উঠলাম। কেন না, যে-ভাষায় ওরা সম্বোধন করল, তা সংস্কৃত—খাঁটি সংস্কৃত।

আমি চমকালাম সব চাইতে বেশি। কারণ, ওরা আমাকে নাম ধরে ডাকল। বলল,—"ডক্টর ভাণ্ডারী,আপনার সঙ্গেই কথা বলতে আমরা এসেছি।"

সৈনিকপুরুষরা হাঁ হয়ে শুনছিল আগন্তুক-দ্বয়ের সংস্কৃত-ভাষণ। প্রথমটা কিছু বুঝেও বোঝেনি। আমার কথা অবশ্য আলাদা। সংস্কৃত আমাকে জানতে হয়েছে জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতেই।

প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলাম। সংস্কৃত সম্বোধনের জবাব সংস্কৃততেই দিলাম। বললাম "তোমরা ফ্লাইং সসার থেকে নামলে। অথচ তোমরা—মানুষ। তবে কি অন্য গ্রহের জীব নও তোমরা ? কে তোমরা ?"

ওদের একজন বলল,—"ঠিক ধরেছেন। আমরা অন্য গ্রহের জীব নই। আমরা বাইরের গ্রহ থেকেও আসি নি। আমরা এ গ্রহেরই

মানুষ। অনেক—অনেক বছর আগে হিমালয় অঞ্চলে আমরা থাকতাম। আমাদের দেশের নাম ছিল অষ্টনাগ। অষ্টনাগ সভ্যতার শীর্ষে উঠেছিল।”

আমি কপাল কুঁচকে বললাম,—“অষ্টনাগ সভ্যতা? এ রকম কোনো সভ্যতার নাম তো আমি শুনিনি?”

ওরা বলল,—“কি করে শুনবেন? দশ হাজার বছর আগে আমাদের দেশ জ্ঞানের শিখরে উঠেছিল। মনের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে বস্তুজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। দশ হাজার বছর আগেকার সেই বিশাল সভ্যতার আজ আর কোন চিহ্নই আপনি হিমালয় অঞ্চলে দেখতে পাবেন না। সব মুছে গেছে।”

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। বললাম,—“তোমাদের মাথা কি খারাপ হয়েছে? দশ হাজার বছর আগে যদি কোনো সভ্যতা লোপ পেয়েও থাকে তো তোমরা কোত্থেকে এলে? হিমালয় অঞ্চলের সব রহস্য এখনো আমরা জানি নি। অনেক অজ্ঞাত সভ্যতার উত্থান-পতন হয়ত সেখানে ঘটেছে—পুরাণে হয়ত তার আভাস আছে। কিন্তু তোমরা কে?”

ওরা ম্লান হাসল। বলল,—“ডক্টর ভাণ্ডারী, সেই কথাই বলতে আমরা এসেছি। আমরা এতদিন ধরে আমাদের পুষ্পকরথ নিয়ে পৃথিবীর সব দেশে চক্কর দিয়েছি, কিন্তু—”

বাধা দিয়ে বললাম,—“পুষ্পকরথ কি হে? ফ্লাইং সসারকে তোমরা পুষ্পকরথ বলো নাকি?”

ওরা বলল—“আমরা শুধু নয়, আপনাদের পুরাণেও তো তাই বলে। এ যুগে আপনারা আমাদের পুষ্পকরথেরই নাম দিয়েছেন উড়ন্ত পিরিচ—ফ্লাইং সসার। কত বছর হয়ে গেল, পৃথিবীকে পাক দিচ্ছি। কত জায়গায় নেমেছি। কিন্তু সবাই ভয় পেয়েছে। আমাদের নিয়ে কত জল্পনাকল্পনা হয়েছে কাগজে কাগজে। কত মিথ্যে গুজব ছড়িয়েছে। কত আতংক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু

কাউকে বলবার সুযোগ পাই নি যে আমরাও মানুষ—দশ হাজার বছর আগে এই পৃথিবীতেই আমরা ছিলাম।

"তারপর দশ হাজার বছর আমরা একনাগাড়ে ঘুমিয়েছি। ঘুম ভাঙার পর থেকেই আমরা হন্যে হয়ে ঘুরছি পৃথিবীবাসীকে সজাগ করার জন্যে। বিপদ আসছে! চরম বিপদ! মহাশূন্য থেকে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবী নিষ্প্রাণ হতে আর বেশী দেরী নেই! ডক্টর ভাণ্ডারী, বিশ্বাস করুন, এমন একজনকেও পাইনি যাকে এ-কথা বলা যায়—যাকে দিয়ে পৃথিবীর প্রত্যাসন্ন বিপদকে ঠেকানো যায়! কিন্তু আপনি ব্যতিক্রম। আপনার সমস্ত খবর আমরা মহাশূন্যে বসেই জেনেছি। কি করে জেনেছি? আপনাকে বললাম তো মনের শক্তিতে আমরা শক্তিমান। মন দিয়ে আমরা পারি না এমন কাজ নেই। মহাশূন্যে বসেও তাই আমরা আপনাকে খুঁজে বার করেছি।

"আপনাকে এ-অঞ্চলে আনার জন্যেই আমরা ঘন ঘন এখানকার আকাশে দেখা দিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। আপনি এসেছেন। আমরাও নেমেছি। হাতে আর বিশেষ সময় নেই। শুনুন, আমাদের কাহিনী।"

অষ্টনাগে আমরা যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিলাম, তা আপনারা কল্পনাতেও আনতে পারবেন না। আপনাদের মহাভারতে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু দু'পাতা ইংরেজীপড়া অল্প বিদ্যায় বিদ্বানরা সে সব কাহিনী বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেন। এই যে পুষ্পকরথ আপনারা দেখছেন—যা নিয়ে আপনাদের গবেষণার অন্ত নেই—এ পুষ্পকরথেও আমরা খুশী হইনি যন্ত্রযানে চেপে মহাকাশে বিচরণ করার অনেক ফ্যাসাদ। আমরা তাই এমন একটা যন্ত্রের কথা ভাব-ছিলাম যার কল্যাণে নিমেষ মধ্যে ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উপস্থিত হতে পারব। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা কল্পকাহিনীর ভক্ত, তাঁরা অবশ্য এ যন্ত্রের নাম দিয়েছেন টেলিপোর্টেশন

মেশিন। অর্থাৎ সুইচ টিপলেই গন্তব্যস্থানে পেঁছোনো যাবে ইথারের মধ্যে দিয়ে।

অক্টনাগের বৈজ্ঞানিকরা দিবারাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে অভিনব এই যন্ত্রের প্রথম মডেলটা প্রায় শেষ করে এনেছেন, এমন সময়ে মহাশূন্য থেকে এল মহাকাশের শমন, ধ্বংসের দেবতার প্রলয়-নৃত্যের আর বুঝি দেরি নেই!

সেদিনের কথা আমাদের আজও মনে পড়ে। ভোর হয়েছে। উষার অরুণাভা পূব দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলেছে। এমন সময়ে দিকচক্রবালের ঠিক ওপরে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। যেন একটা জলন্ত ঝাঁটা নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে!

আমি দেখেই বুঝেছিলাম ধূমকেতু। বিশাল একটা ধূমকেতু-ঝাঁটার মত যার আকার, সূর্যের প্রতিফলিত আলোয় যার সমগ্র দেহ যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আমরা দুজনেই দেখলাম আগুয়ান ধূমকেতুর ভয়ংকর রূপ। দেখেই মতলব স্থির করে ফেললাম। পুষ্পকরথে চেপে সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠলাম। উদ্দেশ্য ছিল ধূমকেতুর কাছে গিয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা।

নক্ষত্রবেগে আমাদের পুষ্পকরথ ধূমকেতুর কাছে গিয়ে পেঁছোলো। ধূমকেতুর গতিবেগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা ছুটে চললাম। গোটা ধূমকেতুকে একপাক ঘুরেও এলাম। তাজ্জব হলাম তখনি।

কারণ এ ধূমকেতু সাধারণ ধূমকেতু নয়। অনেকরকম ধূমকেতু ছায়াপথে ঘোরাফেরা করে, কিন্তু পারার ধূমকেতুও যে থাকতে পারে, তা সেই প্রথম জানলাম। তরল পারদ— যা কিনা ব্রহ্মাণ্ডের সব চাইতে ভারি বস্তু—তাই দিয়েই গড়া ছায়াপথ যাযাবরের প্রলয়-কলেবর।

পুষ্পকরথে অঙ্ক কষার যন্ত্রপাতি চালু করে দিলাম। দেখলাম,

পারদ-ধূমকেতু যত প্রলয়ংকরই হোক না কেন, পৃথিবীর ওপর আছড়ে তো পড়ছেই না, বরং বেশ খানিকটা নিরাপদ ব্যবধানে ফের উধাও হয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে।

হিসেবে আমাদের ভুল হয়নি। কিন্তু এর পরেই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল যার জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

আচমকা পারদ-ধূমকেতুর মাথার কাছে খানিকটা পারা ফুলে উঠে ছিটকে বেরিয়ে এল। তরল পারার বিশাল একটা পিণ্ড শূন্যপথে ছুটে চলল পৃথিবীর দিকে!

সর্বনাশ! পৃথিবীর টানেই যে এ কাণ্ড ঘটেছে, তা বুঝতে এক সেকেণ্ডও লাগল না। ধূমকেতুটার দেহ তরল পারায় গড়া, না হলে এ সর্বনাশ ঘটত না। চাঁদের টানে যেমন সমুদ্রের জল ফেঁপে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবেই পৃথিবীর টানে ধূমকেতুর পারা ছুটে চলল পৃথিবী লক্ষ্য করে।

আমরা নিরুপায় হয়ে তাকিয়ে রইলাম। করবার কিছুই ছিল না। নিয়তির মার একেই বলে। তা না হলে তরল পারার বিশাল তরঙ্গ আমাদের অষ্টনাগ অঞ্চলেই এসে আছড়ে পড়বে কেন?

যেন একটা উপসাগর ভেঙ্গে পড়ল হিমালয় অঞ্চলে। পড়ল ঠিক অষ্টনাগ অঞ্চলেই। যুগ যুগ ধরে যে সভ্যতা উন্নতির শিখরে উঠেছিল, নিমেষে তা চুরমার হয়ে গেল গুরুভার পারদের প্রচণ্ড সংঘাতে। আকাশচুম্বী ইমারতগুলো বালির প্রাসাদের মত চোখের সামনে ভেঙে পড়ল। অসহায় চোখে আমরা দেখলাম, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের সাধের অষ্টনাগের আর কোনো চিহ্নই রইল না। ফুলে-ফুঁসে পারার উপসাগর দিকে দিকে প্রবাহিত হল। যেখানে যা ছিল, সব নিশ্চিহ্ন করে দিল।

ধূ ধূ মহাশ্মশানের ওপর উন্মাদের মত চড়কিপাক খেতে লাগল আমাদের পুষ্পকরথ। কোথায় যাব? কোথায় নামব? অষ্টনাগই আমাদের ঘর। সে ঘর যে নিশ্চিহ্ন করেছে, ঐ তো সেই পারার

ধূমকেতুর পুচ্ছ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে কি আমরা ধূমকেতুর পেছনে ধাওয়া করবো ?

কর্তব্য স্থির করতে কয়েক মিনিট লাগল। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যানমত কাজ শুরু করলাম। আমরা দুজনেই বৈজ্ঞানিক। মানবকল্যাণ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি নিয়ে আঁকজোক করতে বসলাম। প্রলয়-ধূমকেতুর গতিপথ বার করতেই হবে। তাহলেই দূর ভবিষ্যতে আবার যখন সেই পথে ধূমকেতু হানা দেবে পৃথিবীর আকাশে, তখন যেন ভবিষ্যতের পৃথিবী হুঁশিয়ার হতে পারে।

মাস কয়েক গেল হিসেব শেষ করতে। পুষ্পকরথের হিসাব কক্ষে বসেই ছবি আঁকলাম! ছায়াপথের অগণিত তারকার মধ্যে দিয়ে যে পথে ধূমকেতু আবার ফিরে আসতে পারে পৃথিবীকে লক্ষ্য করে, তা একে ফেললাম। কালো বোর্ডের ওপর ডিম্বাকার গতিপথের দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলাম, আরও দশ হাজার বছর পরে পারার ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব ঘটবে পৃথিবীর আকাশে।

দশ হাজার বছর! দশ হাজার বছর পর পারদ ধূমকেতু পুচ্ছ উড়িয়ে আসবে পৃথিবীর আরও অনেক মহাদেশের সর্বনাশ করতে! কিন্তু কি করি! কি করে রোধ করা যায় তার সর্বনাশা অভিযান ?

ভেবে ভেবে সে পথও এক সময় বেরুলো। ঠিক করলাম, এমন একটা প্রচণ্ড যন্ত্র সৃষ্টি করব—যা দিয়ে পারদ ধূমকেতুকে মহাশূন্যেই ধ্বংস করা যাবে। কিন্তু তার জন্যে দশ হাজার বছর প্রতীক্ষা করা দরকার।

কিন্তু অতকাল প্রতীক্ষা করা কি করে সম্ভব ? সে উপায়ও স্থির করলাম। আপনারা এখন যাকে সাস্‌পেণ্ডেড অ্যানিমেশন' বলেন আমাদের যুগে তা চালু ছিল। কুম্ভকর্ণের মত আমরা হিম-ঘুম ঘুমোতে পারতাম। হিমাঙ্কে নামিয়ে আনা হত শয়নকক্ষের তাপমাত্রা; তারপর সেই কনকনে ঠাণ্ডায় আমরা মৃতের মত নিশ্চল হয়ে ঘুমোতাম। কয়েক শ' বা কয়েক হাজার বছর একটানা ঘুমোলেও আমরা বুড়িয়ে

যেতাম না। আপনারা এখন এই হিম-ঘুম নিয়ে জোর গবেষণা করছেন। কেননা মহাকাশে রকেট নিয়ে অভিযান চালাতে গেলে, হিম-ঘুম আয়ত্ত করতেই হবে। মহাশূন্যে এক নক্ষত্র থেকে আর এক নক্ষত্রের জগতে যেতে কয়েক পুরুষ কেটে যায়, হিম-ঘুম ছাড়া এ দীর্ঘ সময় রকেটে কাটানো কোনো মতেই সম্ভব নয়।

আমরাও তাই ঠিক করলাম, দশ হাজার বছরের জন্যে একনাগাড়ে হিম-ঘুম ঘুমোবো। আটোমেটিক মেশিন চালু থাকবে। দশ হাজার বছর পরে আপনা হতেই ঘুম ভাঙবে। তাছাড়া আরো একটা জিনিস হবে। পুষ্পকরথ সূর্যের শক্তিতে চলে। কাজেই এই দশ হাজার বছর ধরে পৃথিবীকে সূর্যের শক্তিতে প্রদক্ষিণ করবে পুষ্পকরথ। পৃথিবীর লোক অবশ্য দেখতে পাবে না, কেননা রথ থাকবে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পঁচাত্তর হাজার মাইল ঊর্ধ্বে।

একনাগাড়ে কথা বলার পর আগন্তুকরা থামল। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম আমি। আমি যাঁর অতিথি, সেই সামরিক অফিসারও ভ্রূকুঞ্চন করে বসেছিলেন।

কিছুক্ষণ থমথমে নৈঃশব্দের পর আমি শুধোলাম,—"ধূমকেতু-ধ্বংসের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন?"

"করেছি।"—বলল একজন আগন্তুক।

"দেখাবেন?"—শুধোলাম আমি।

"নিশ্চয়। আসুন।"—বলে ওরা আমাকে এবং মিলিটারী অফিসারকে নিয়ে গেল ফ্লাইং সসারের মধ্যে। বিশাল গম্বুজের মধ্যে ঢুকে চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার! বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু এত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা এমন আজব ল্যাবরের আমি জীবনে দেখিনি। হরেক রকম কলকব্জার কোনোটাই আমি চিনতে পারলাম না। এত জটিল যন্ত্রবিজ্ঞান যারা আয়ত্ত করেছে, তারা যে সাধারণ পুরুষ নয়—তা দেখলেই উপলব্ধি হয়। আগন্তুকরা যে শুধু মনোবিজ্ঞানেও চরম

উন্নত, তা আমি নিজে বৈজ্ঞানিক হয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম।

গম্বুজ-গবেষণাগারের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা মস্ত ব্ল্যাকবোর্ড। তার ওপরে ছায়াপথের ছবি আঁকা। কালো মহাকাশে নক্ষত্রের কুচি। একটি মাত্র ডিম্বাকার রেখা ঘিরে রয়েছে সমস্ত ছায়াপথটিকে। বুঝলাম এটাই হল পারার ধূমকেতুর গতিপথ।

একদৃষ্টে চেয়েছিলাম কালো বোর্ডে আঁকা ছায়াপথের নিখুঁত মানচিত্রের দিকে। বিস্ময় আর অবিশ্বাস যেন একসাথে তালগোল পাকিয়ে এক দুরূহ ধাঁধার সৃষ্টি করেছিল আমার মাথায়।

আগন্তুকদের একজন বলল,—"আর বেশি সময় নেই। পারার ধূমকেতুর আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। অটোমেটিক যন্ত্রের সাহায্যে ধূমকেতু-ধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রটা এবার আমরা নিক্ষেপ করব। কিন্তু আমাদের কোন কাজে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।"

আমি ওদের ইচ্ছে তর্জমা করে বললাম সঙ্গী অফিসারকে। উনি বললেন—"বেশ তো, তার আগে ডক্টর ভাণ্ডারীর সঙ্গে আমি একটু গোপন আলোচনা করতে চাই। আপনারও আসুন।"

দুই আগন্তুককে ডেকে নিয়ে আমরা উড়ন্ত পিরিচের বাইরে এলাম। জমিতে নেমে ওরা একটু দূরে দাঁড়াল। মিলিটারী অফিসার হঠাৎই পুরোদস্তুর মিলিটারী হয়ে গেলেন। কয়েকজন অধস্তন অফিসারকে ডেকে নিম্নকণ্ঠে কি সব হুকুম দিতে লাগলেন। ওরা ফ্লাইং সসার ঘিরে ছুটোছুটি করতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে বললাম,—"একি করছেন? সময় কম, ওরা যা করতে চাইছে করতে দিন।"

মুচকি হেসে অফিসার বললেন,—'ওদের গালগল্প আপনিও বিশ্বাস করেছেন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা পৃথিবীর কেউ নয়। পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছে পৃথিবীকে জয় করতে। মানুষের ছদ্মবেশে সংস্কৃত বুলি আউড়ে ওরা আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু আমি এত বোকা নই। বিনা বাধায় ওদের যন্ত্রপাতি নাড়তে দেওয়া মানেই আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনা।"

এমন সময় আমার চোখ পড়ল আগন্তুকদের ওপর। ওরা পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিল সঙ্গী অফিসারের দিকে। আমি তাকাতেই একজন বলল, "আগেই বলেছি আমাদের মনের শক্তি অসীম। আপনার বন্ধুর ভাষা আমরা জানি না, কিন্তু তার মনোগত অভিপ্রায় আমরা জেনে ফেলেছি। তাই আমরা চললাম। বিদায়. বন্ধু, বিদায়।"

বলেই তারা দৌড়লো ফ্লাইং সসারের সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির

গোড়ায় শান্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। আগন্তুকদের রোখবার জন্যে বন্দুক তুলল তারা। কিন্তু তার আগেই একজন আগন্তুক কোমর থেকে একটা বল বার করে মাথার ওপর তুলল। সঙ্গে সঙ্গে নীল আলোর ঝলকানি দেখা গেল বলের মধ্যে। অলোক-রশ্মি ধেয়ে গেল শান্ত্রী দুজনের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে তারা পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর মত অবশ দেহে বসে পড়ল।

নিঃশব্দ নীল বিদ্যুতের এই আশ্চর্য শক্তিহরণ ক্ষমতা দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখলাম, অগন্তুকরা অন্তর্হিত হয়েছে উড়ন্ত পিরিচের মধ্যে। দেখতে দেখতে ধাতুর সিঁড়ি অদৃশ্য হল ভেতরে। ডালা বন্ধ হয়ে গেল এবং শূন্যে উঠল ফ্লাইং সসার।

সহসা তীক্ষ্মকণ্ঠের চীৎকারে চমকে উঠলাম। হুকুম দিচ্ছেন অফিসার। বিমান-বিধ্বংসী কামানে শেল লোড করছে গোলন্দাজ। আর একজন কামানের নল ঘুরিয়ে তাক করছে পুষ্পকরথকে।

যে মুহূর্তে কামান থেকে শেল নিক্ষিপ্ত হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎচমকের মতই একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে! লাফিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। কামানের লক্ষ্য যে স্থির করছিল, তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলাম। আর তক্ষুণি বিপুল গর্জনে মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল, কিন্তু গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। উড়ন্ত পিরিচ মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত হল নক্ষত্রবেগে।

বাজের মত হুঙ্কার দিলেন অফিসার—"ডক্টর ভাণ্ডারী! এ কী করলেন! এ যে বিশ্বাসঘাতকতা! এর শাস্তি আপনাকে পেতে হবে!"

আমি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। রুদ্ধশ্বাসে শুধু বললাম,—"দেখুন—"

চোখ তুললেন অফিসার।

দূর দিগন্তে দেখা গেল সুবিশাল এক পুচ্ছ। জ্যোতির্ময় পুচ্ছের বর্তুলাকার অগ্রভাগ যেন জ্বলছে সূর্যালোকে! ঠিক যেমনটি বর্ণনা

করেছিল আগন্তুকরা। পারদ-ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীর আকাশে। দশ হাজার বছর পর প্রলয়-ধূমকেতু ফিরে এসেছে পারার তরল স্রোতে জনপদের পরজন পদ নিশ্চিহ্ন করে দিতে!

এর পরেই আকাশে যে নাটক অভিনীত হল, তা আরো ভয়ানক।

মেঘের আড়াল থেকে সহসা আবির্ভূত হল অষ্টনাগের পুষ্পকরথ। খসে-পড়া তারার মতই উল্কা-বেগে সিধে ধেয়ে গেল পারার ধূমকেতুর দিকে। গতি পথ দেখেই শিহরিত হলাম আমি। মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য একান্ত লালায়িত উড়ন্ত পিরিচ, যেন ধূমকেতুর পারদ-কবরে সমাহিত হবার জন্যেই উন্মত্ত হয়েছে পুষ্পকরথ! কিন্তু কেন কেন এই আত্মঘাতী অভিযান?

জবাব পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। মনে পড়ল, আগন্তুকরা বলেছিল, অটোমেটিক যন্ত্রের সাহায্যে ওরা ধূমকেতু-ধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করবে। কিন্তু তার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ আমরা দিইনি। অটোমেটিক যন্ত্র ওরা তাই চালু করতে পারে নি, কিন্তু ধূমকেতুর করাল মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে। অগত্যা ওরা নিজেরাই ক্ষেপণাস্ত্র হয়ে গিয়েছে। ধূমকেতু-ধ্বংসী যন্ত্র নিয়ে নিজেরাই এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের কেন্দ্রে—প্রলয়ের জঠরে···

পরমুহূর্তে চোখের সামনে দেখলাম আকাশ-নাটকের শেষ দৃশ্য।

আলোকরশ্মির মত তীব্র গতিবেগে ধূমকেতুর মাথার মধ্যে কি যেন প্রবেশ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটল।

কয়েক মিনিট পর দেখা গেল, ধূমকেতুর আর চিহ্ন নেই। পারার পিণ্ড মহাশূন্যেই বিলীন হয়ে গিয়েছে।

অভিভূতের মত চেয়েছিলেন মিলিটারী অফিসার। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই বললেন,—"সরি, ডক্টর ভাণ্ডারী! কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে, ওরা মিথ্যে বলেনি?"

"ওদের ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা ছায়াপথের ছবি দেখে। আমি ছায়াপথ নিয়ে গবেষণা করছি। আমি জানি, যুগ যুগ ধরে ছায়াপথে গ্রহ-

নক্ষত্রের অবস্থান ক্রমাগত পালটে যাচ্ছে। রাতের আঁধারে আকাশে তাকিয়ে কালপুরুষ'কে আপনি যেখানে দেখবেন, দশ হাজার বছর পরে বা আগে সেখানে দেখতে পাবেন না। ওদের ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা নক্ষত্রদের অবস্থান দেখে কি রকম যেন খটকা লেগেছিল। মনে মনে হিসেব করছিলাম। আচমকা উত্তর পেলাম। দশ হাজার বছর আগে না আঁকলে ছায়াপথের অমন মানচিত্র কখনই সম্ভব নয়। অর্থাৎ ওরা সত্যিই দশ হাজার বছর আগেকার বিজ্ঞানী, হিম-ঘুম ঘুমিয়ে এ যুগে জেগেছে শুধু পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যেই। ওরা শুধু মানুষ নয়—ওরা মহামানব।"

গদগদ কণ্ঠে মিলিটারী অফিসার বললেন,—"বিশ্ব বাসী আপনার ঋণ কোনদিন ভুলবে না, ডক্টর ভাণ্ডারী। আপনি মহামানব।"

ম্লান হেসে বললাম,—"কিন্তু তাতে তো আমার মনের গ্লানি মুছবে না। ঐ দুই অতিমানুষ দশ হাজার বছর প্রতীক্ষা করেছিল শুধু আমাদের বাঁচিয়ে নিজেরা বাঁচবে বলে। কিন্তু ওদের আমরা বাঁচতে দিলাম না। অথচ ওরা মরে আমাদের বাঁচিয়ে গেল। মহামানব আমি নই, মহামানব ওরা—যারা আর মহাকাশ থেকে ফিরবে না!"

———

নক্ষত্র

পৃথিবী এখন তিনহাজার আলোক বর্ষ দূরে।...

এক সময়ে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতুম, ভগবান আছেন। মহাকাশ-বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক না কেন, ভগবান থাকবেন। বিশ্বরহস্যের কণা মাত্র গৌরবও আমরা মুছে ফেলতে পারবো না আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রগতি দিয়ে।

কিন্তু আজ? আজ সন্দেহ জাগছে দেয়ালে মার্ক VI কম্পিউটারের নিচে ঝোলানো ঐ ক্রুশটা সত্যই একটা ফাঁপা প্রতীক কিনা। সন্দেহ জাগছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে।

এখনও কাউকে বলিনি সে কথা। কিন্তু আর লুকিয়েও রাখা যাবে না। অগণিত মাইল দীর্ঘ ম্যাগনেটিক টেপ আর হাজার হাজার ফটোগ্রাফের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে সে সব তথ্য। এ সবই পৃথিবীতে বয়ে নিয়ে চলেছি আমরা। তারপর? যে কোন বিজ্ঞানী আমার মতই নিজেই জেনে ফেলবে সেই পরম সত্যকে—যা আমি এতদিন ধরে সযত্নে গোপন করেছি ফিতে, ছবি আর আমার মগজের মধ্যে।

সঙ্গীরা এর মধ্যেই বেশ খানিকটা দমে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের এই পরিহাস ওরা কি ভাবে নেবে জানি না। ওদের অনেকেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা চলে ওদের মধ্যে। ছিলুম পাদরী। হয়েছি চীফ অ্যাসট্রোফিজিসিষ্ট। তা সত্ত্বেও কিন্তু আমাকে কুপোকাৎ করার যে অস্ত্র ওরা দুদিন বাদে হাত পাবে—তা নিয়ে পুলকিত হতে পারবে না কেউই।

ডক্টর স্যাণ্ডার পয়লা ঈশ্বরের নাস্তিক. ভদ্রলোক কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে আমি একজন পাদরী। মাঝে মাঝে অবজারভেসন-ডেকে আমার পাশে এসে দাঁড়ান ডক্টর। আলো এখানে ক্ষীণ— তাই

চারপাশে হীরক কুচির মতই ঝিকমিক করতে থাকে অগণিত তারকা। নিঃশব্দে আমার পাশে এসে দাঁড়ান উনি। ডিমের আকারে তৈরী বিরাট পোর্ট দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মহাকাশের পানে—আর খুব আস্তে আস্তে ঘুরপাক খেতে খেতে পেছনে সরে যেতে থাকে অজস্র চুমকি বসানো মহাকাশপথ।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর বলেন ডক্টর স্যাণ্ডার—"ফাদার, হয়তো এ সবই কারোর সৃষ্টি। কিন্তু বলতে পারেন, কেন এই সৃষ্টি, আর কেনই বা তার ধ্বংস? সৃষ্টিকর্তার স্বার্থ কি এতে?" সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে যায় তর্ক। আর, অবজারভেসন পোর্টের নিখুঁতভাবে পরিষ্কার প্ল্যাষ্টিকের ওপরে সীমাহীন রেখায় নিঃশব্দে ঘুরতে থাকে নক্ষত্র আর নীহারিকার রাশি।

জানি না নীহারিকার এরকম অদ্ভুত নাম কে দিয়েছে। এরকম বাজে নাম আমি আর শুনি নি। এ নামের মধ্যে যদি কোন ভবিষ্যদবাণী লুকিয়ে থাকে, তবে তার সভ্যতা যাচাই করতে কয়েক কোটি বছর কেটে যাবে। তাছাড়া নীহারিকা শব্দটিও বেখাপ্পা। সারা ছায়াপথ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কুয়াশার অকল্পনীয় মেঘ—জন্মের আগে নক্ষত্রসমূহের উপাদান মিশ্রণ—তাদের তুলনায় অনেক ছোট এই নীহারিকারা। আর, মহাজাগতিক মাপকাঠিতে বাস্তবিকই ফিনিক্স নীহারিকা তো একেবারেই পুঁচকে বস্তু—ফাঁপা গ্যাসের মোড়কে একটি-মাত্র নক্ষত্র।

অথবা একটি নক্ষত্রের অবশিষ্ট……

পৃথিবী ছেড়ে রওনা হয়েছিলুম এই ফিনিক্স নীহারিকা অভিমুখে। সার্থক হয়েছে আমাদের অভিযান। আজ আমরা ফিরে চলেছি জ্ঞানের স্তূপ নিয়ে। কিন্তু আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম, যদি এখুনি এই স্তূপ নামিয়ে দিতে পারতুম কাঁধ থেকে।

ঈশ্বর, তুমি কি আছো? আমি যা দেখেছি, যা জেনেছি, তারপর তো আর বিশ্বাস করা যায় না তোমার অস্তিত্বে!

ফিনিক্স নীহারিকা আগে কি ছিল তা আমরা জানি। প্রত্যেক বছর শুধু আমাদের ছায়াপথেই যত নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটে তাদের সংখ্যা একশোরও বেশী। বিস্ফোরণের পর কয়েক ঘণ্টার জন্যে প্রচণ্ড তেজে জ্বলতে থাকে তাদের ফেটে পড়া দেহ, কখন' দিনের পর দিন কেটে যায় এই অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি কমে আসতে।

স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের বহু হাজার গুণ বেশী এই দীপ্তি। তারপর তা নিভে যায় ধীরে ধীরে, আসে মৃত্যু। অসীম ব্রহ্মাণ্ডে এ তো নিয়মিত দুর্ঘটনা। চাঁদের মানমন্দিরে কাজ করাও সময়ে এরকম ডজনখানেক নোভার স্পেকট্রোগ্রাম আর আলোকবৃত্তের রেকর্ড রেখেছি আমি।

কিন্তু প্রতি হাজার বছরে বার তিন-চারের জন্যে এর চাইতেও ভরাবহ যে কাণ্ড ঘটে এই ব্রহ্মাণ্ডে, তার কাছে নোভাও নিতান্ত তুচ্ছ। কোনো নক্ষত্র যখন সুপারনোভা হয়ে দাঁড়ায়, তখন যে কোন ছায়াপথের সব কটা সূর্য এক করলেও হার মেনে যায় তার তেজের কাছে। ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে চীন জ্যোর্তির্বিজ্ঞানীরা এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন—কি যে হ'ল কিছুই বুঝতে পারেন নি। পাঁচশো বছর পরে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ক্যাসিওপিয়াতে একটা সুপারনোভা এমন তেজে জ্বলে উঠেছিল যে দিনের আলোতেও তা দেখতে অসুবিধে হয়নি। এরপরের হাজার বছরে এরকম আরও তিনটি সুপারনোভা দেখা গিয়েছে।

আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এইরকম একটা বিপর্যয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসা। বিপর্যয়ের কারণ কি এবং কোন কোন চমকপ্রদ ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপে এহেন বিস্ফোরণ—তা জেনে আসা। দীর্ঘ ছ'হাজার বছর আগে বিস্ফোরিত গ্যাসের গোলকের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলুম আমরা। একটা গোলকের বাইরে আর একটা গোলক, তার বাইরে আর একটা—ফাঁপা খোলসের মত এইভাবে পর পর সাজানো গ্যাসের স্তর। ছ'হাজার বছর আগে বিস্ফোরণের সময়ে এইভাবেই তা বিক্ষিপ্ত

হয়েছিল একই কেন্দ্র থেকে—আজও বিরাম নেই তার ছড়িয়ে পড়ার। সত্যিই বিস্ময়কর। ভীষণ উত্তপ্ত এই গ্যাসের ফাঁপা গোলক থেকে আজও ছিটকে আসছিল চোখ ধাঁধানো ভয়ংকর বেগুণী আলো। কিন্তু তা এতই সূক্ষ্ম যে মোটেই ক্ষতিকর নয় আমাদের পক্ষে। ফেটে পড়ার সময়ে নক্ষত্রের বাইরের স্তরগুলো এমন প্রচণ্ড বেগে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, মাধ্যাকর্ষণের আওতা ছাড়িয়ে তা ছিটকে গিয়েছিল মহাকাশের সুদূর অংশে। এখন এইগুলোই বিরাট একটা ফাঁপা খোলসের সৃষ্টি করেছে, যার মধ্যে একটা নয়, একহাজার সৌরজগত সেঁধিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। ঠিক কেন্দ্রে দাউ দাউ করে জ্বলছিল একটা ক্ষুদে বস্তু—এক সময়ে যা নক্ষত্র নামে পরিচিত ছিল—ছোট্ট এই শ্বেপণ্ডি আকারে আমাদের পৃথিবীর চাইতে অনেক পুঁচকে হলেও ওজনে তার চাইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী ভারী! অতিবড় দুঃস্বপ্নেও যা ভাবা যায় না—তাই!

আমাদের চারপাশে ঘিরে ছিল প্রদীপ্ত গ্যাসের সেল—প্রখর আলোয় দুই তারকার মধ্যবর্তী মহাকাশের স্বাভাবিক রাত্রি উধাও হয়েছিল ছ'হাজার বছর আগেই। আমরা উড়ে চলেছিলুম মহাজাগতিক বোমার ঠিক কেন্দ্রে—বহু বছর আগে শুরু যার প্রথম বিস্ফোরণ ক্রিয়া—যার জ্বলন্ত আলোকময় টুকরোগুলো এখনও কল্পনায় আনা যায় না এমন বেগে ধেয়ে চলেছে দিগ্‌বিদিকে। কোটি কোটি মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে যে বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া—তাদের গতিশীলতা শুধু চোখে ধরা যায় না। নিদারুণ আলো আর উত্তাপ বিকিরণ করছে যে গ্যাসকুণ্ডলী, তার অস্থিরতা যন্ত্রের সাহায্য বিনা পরিমাপ করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে প্রাথমিক গতিবেগকে কমিয়ে এনেছিলুম আমরা। এখন ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলু সামনের ভয়ংকর ছোট্ট নক্ষত্রটার দিকে। একসময়ে আমাদের সূর্যের মতই ছিল তার তেজ-কিন্তু মাত্র ক'টি ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষিত করে ফেলেছে সে নিজেকে

শক্তির সেই বিপুল অপচয় না ঘটলে আরও কত নিযুত বছর ধরে প্রদীপ্ত থাকতো তার বিপুল দেহ এ যেন স্বল্প পরিসরে সঞ্চিত সম্পদের মধ্যে দিয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ যৌবন স্মৃতির রোমন্থন।

গ্রহ দেখতে পাবো, এরকম আশা আমরা কেউই করিনি। বিস্ফোরণের আগে যদিও বা থাকতো, এখন তো পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্পে পরিণত হয়ে হারিয়ে গিয়েছে—নক্ষত্রের বৃহত্তর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে! কিন্তু নিয়মমাফিক অটোমেটিক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। অজ্ঞাত সূর্যের দিকে এগোলেই এ নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হয়। নক্ষত্র থেকে বহু বহু দূরে ঘূর্ণমান ছোট্ট গ্রহটাকে সেই কারণেই খুজে পেয়েছিলাম আমরা। আমাদের সৌরজগতে প্লুটোর যা অবস্থা—এই সৌরজগতে এ বেচারী গ্রহেরও সেই অবস্থাই দেখলাম। পরিবার থেকে বহুদূরে একাকী ঘুরে চলেছে অনন্ত রাত্রির সীমারেখা বরাবর। কেন্দ্রীয় সূর্য থেকে এতদূরে এর অবস্থান যে জীবনের স্পন্দন কোনদিনই দেখা যায়নি তার বুকে—শুধু বিপুল দূরত্বের জন্যেই বেঁচে গিয়েছে অন্যান্য সঙ্গীদের শোচনীয় পরিণতি থেকে।

পাহাড়গুলো ঝলসে গিয়েছে আগুনের লেলিহান শিখায়··· বিপর্যয়ের বহু পূর্ব থেকে যে জমে গ্যাসের ম্যান্টল ঘিরেছিল গ্রহটিকে, অগ্নিস্রোতে তাও জ্বলে খাক হয়ে গিয়েছে। নেমে পড়লাম আমরা। নেমেই দেখতে পেলাম ভল্টটাকে।

ভল্টনির্মাতাদের উদ্দেশ্যই ছিল তাই। প্রবেশপথের সামনেই একখানি পাথর কুঁদে তৈরী স্তম্ভ গলে অনেক নীচে নেমে এলেও দূরপাল্লার ফোটোগ্রাফ থেকেই বুদ্ধির স্বাক্ষর লক্ষ্য করেছিলুম। একটু পরেই পেলুম সারা মহাদেশে ছড়ানো রেডিও অ্যাকটিভিটির প্যাটার্ন। পাথরের তলায় তা ঢাকা পড়ে গেলেও আমাদের যন্ত্রে তা ধরা পড়লো। ভল্টের ওপর অনেকটা মিশরীয় স্থাপত্যরীতিতে তৈরী সুউচ্চ পাইলনটা ধ্বংস হয়ে গেলেও যা ছিল তাই থেকেই কল্পনা করে নিয়েছিলুম তার আকৃতি। ধ্বংস না হয়ে গেলে অনন্তকাল ধরে

আকাশের তারাদের সে নিমন্ত্রণ জানাতো সুউচ্চ শির তুলে। লক্ষ্যবস্তুতে ছুটে চলা তীরের মতই এই সুবিশাল চাঁদমারীর কেন্দ্রবিন্দুতে নেমে এল আমাদের মহাকাশপোত।

নিশ্চয় মাইল খানেক উঁচু করে তৈরী করা হয়েছিল পাইলনটাকে। আজ কিন্তু তা গলে গলে নিভে যাওয়া মোমবাতির মতই নেমে এসেছিল অনেক নীচে। জমে যাওয়া গলিত পাথর খুঁড়তেই এক হপ্তা গেল। কেন না, আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ নই—জ্যোর্তিবিজ্ঞানী—তবুও হাল ছাড়বার পাত্র নই। তাই মূল উদ্দেশ্য ভুলে যেতে বাধ্য হলুম এক ভয়ানক চিন্তায়—মৃত সূর্য থেকে এত দূরে এই পরিত্যক্ত জগতে এরকম নিদারুণ পরিশ্রম করে এই একক মনুমেণ্ট বানানোর একটি মাত্রই উদ্দেশ্য থাকতে পারে: তা হলো, মৃত্যু আসন্ন জেনে অমর হওয়ার শেষ চেষ্টা করে গেছে এক সুউন্নত সভ্যতা।

কয়েক পুরুষ কেটে যাবে ভল্টের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পদের হিসাব নিতে। চরম বিস্ফোরণের অনেক অনেক বছর আগে থেকেই নিশ্চয় বিপদসংকেত পাঠাতে শুরু করেছিল নির্বাসিত এই জগতের হতভাগ্য সূর্য—তাই তৈরী হওয়ার প্রচুর সময় পেয়েছিল তারা। সবশেষ হয়ে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই ধীশক্তির যাবতীয় সৃষ্টি এই প্রাণহীণ গ্রহে বয়ে নিয়ে এসেছিল তারা এই আশায় যে, একদিন না একদিন অন্য জাতির চোখে পড়বে তাদের সভ্যতার নিদর্শন—ফলে মরেও অমর হয়ে রইবে তারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই।

হায় রে, যদি আরও কিছু সময় পেতো ওরা! এই সূর্যেরই গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ানোর বিজ্ঞান তারা রপ্ত করছিল—নক্ষত্র ভ্রমনের বিদ্যা ছিল অজ্ঞাত। তাই একশো আলোকবর্ষ উড়ে গিয়ে সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রে আশ্রয় নেওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না সেই অন্তিম মুহূর্তে। অবশ্য ট্রান্সফিনিট ড্রাইভের রহস্য তারা সে সময়ে জানলেও কয়েক লক্ষের বেশী জীবন রক্ষা কোনোমতেই হতো না। তাই, বোধহয় এই ছিল মন্দের ভালো।

স্থাপত্য থেকে জেনেছিলুম ওদের চেহারা প্রায় মানুষদের মতই। মানবিক চেহারা না পেলেও কি ওদের এই শোচানীয় পরিণতির জন্যে আমরা চোখের জল ফেলতুম না! হাজার হাজার চাক্ষুষ রেকর্ড রেখে গিয়েছিল ওরা ভল্টে—তা' পর্দায় ফুটিয়ে তোলার জন্যে ছিল বিচিত্র মেশিন; ছবিসহ এমন সব বিস্তারিত নিদর্শন আমরা পেয়েছি যা থেকে ওদের লিখিত ভাষা শিখে নেওয়াও খুব বেশী কঠিন হবে না। এরকম অনেক রেকর্ড ঘেঁটে ছ'হাজার বছরের মধ্যে এই প্রথম আমরা আবার জীবন্ত করে তুলেছি সেই সভ্যতাকে—একদিন যা সৌন্দর্যে গরিমায় অনেকদিক দিয়ে আমাদের সভ্যতার চাইতে ছিল অনেক উন্নত। সম্ভবত ওদের সেরা দিকটাই ওরা তুলে ধরতে চেয়েছে ভাবী-কালের জাতের কাছে—কিন্তু সে জন্যে তাদের বেশী দোষও দেওয়া যায় না। ভারী সুন্দর ছিল সেই দুনিয়া, শহরগুলো এত চমৎকার যে মানুষের তৈরী যে কোন শহরের সঙ্গে তার তুলনা চলে। আমরা দেখেছি ওদের কাজ করতে, খেলা করতে, শুনেছি গানের মত বক্তৃতা শত শত বছরের ওপার থেকে। একটা দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসছে—অদ্ভুত নীল বালির ওপর খেলায় মেতেছে একদল ছেলেমেয়ে—খেলা করছে দামাল ঢেউয়ের সাথে—যেমনটি পৃথিবীতে দেখা যায়। চাবুকের মত বিদঘুটে গাছের সারি রয়েছে বেলাভূমি বরাবর। বিরাট আকারের কয়েকটা জন্তু ঘুরছে এদিকে সেদিকে—কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই কারোরই।

আর, সমুদ্রে ডুবছে সূর্য। তখনও তা প্রাণ-প্রদায়িনী বন্ধুর মতই উষ্ণ। রক্তবর্ণ। দুদিন পরেই যা বিশ্বাসহন্তার মতই মুছে দিয়েছে এই নির্দোষ সুখের প্রাচুর্যকে।

সম্ভবত বাড়ী থেকে এতদূরে না এলে আর এই রকম নিঃসীম নির্জনতার মধ্যে না থাকলে আমরা এতটা বিচলিত হতুম না। অন্যান্য গ্রহের ওপর বহু সভ্যতার ভগ্নস্তূপ দেখে এসেছে আমাদের অনেকেই। কিন্তু কখনই এভাবে কেউ মুষড়ে পড়েনি। বাস্তবিকই, অতুলনীয় এই

ট্র্যাজেডি। পৃথিবীর ওপর এক এক জাতির আর সংস্কৃতির উত্থান আর পতন অন্য জিনিস, কিন্তু সভ্যতার চরম শিখরে উঠতে একজন পুরুষও না রেখে সম্পূর্ণভাবে মুছে যাওয়া আর এক জিনিস। ঈশ্বরের করুণা বলে কি কোনো বস্তু এর পরেও থাকতে পারে?

সহকর্মীরা এই কথাই বার বার জিজ্ঞেস করেছে আমাকে। যা পেরেছি, তাই উত্তর দিয়েছি। কি উত্তরই বা দেব? জীব হিসেবে তো ওরা খারাপ ছিল না। জানি না কোন ভগবানকে পুজো করতো ওরা—করতো কিনা তাও জানি না। কিন্তু বহু শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে আমি দেখেছি নিভে আসা সূর্যের ছায়াতেও অক্ষুণ্ণ থেকেছে তাদের মহিমা, তাদের সৌন্দর্য। ওদের কাছে অনেক কিছুই শিখতে পারি আমরা। তবুও কেন ধ্বংস করা হলো ওদের?

পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার পর এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে আমার সহকর্মীরা—আমি তা জানি। বলবে, ব্রহ্মাণ্ডের কোন উদ্দেশ্যই নেই, কোন পরিকল্পনা নেই। যেহেতু আমাদের ছায়াপথেই প্রতি বছরে বিস্ফোরণ ঘটছে একশোটা সূর্যের—সুতরাং এই মুহূর্তে মহাকাশের গভীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে একটা না একটা জাতি। সারা জীবন ধরে তারা ভাল করেছে কি মন্দ করেছে, অন্তিমকালে তার কোনো মানেই থাকছে না—কেন না, ভগবানের বিচার বলে কিছুই নেই···নেই ঈশ্বর স্বয়ং।

কিন্তু আমরা যা দেখেছি, তা দিয়ে এ রকম কিছুই প্রমাণ করা যায় না। এভাবে তর্কের ঝড় যারা তুলবে, ধরে নিতে হবে তারা ভাবাবেগে আকুল হয়েছে—যুক্তির ভিত্তিতে নয়। মানুষের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোনো দরকার আছে কি ঈশ্বরের? যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড গড়েছেন, যখন খুশী অণুপরমাণুতে বিলীন করে দেওয়ার অধিকারও তাঁর আছে। তিনি কি করতে পারেন আর কি পারেন না—তা নিয়ে প্রশ্ন করা চরম স্পর্ধা অথবা শয়তান উপাসনারই নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি মেনে নিতে পারতুম এই ব্যাখ্যাকে—যদিও জীবন সমেত এতগুলো গ্রহকে চুল্লির মধ্যে ফেলে দেওয়ার কল্পনাও অতি ভয়াবহ। কিন্তু এরপরেই আসছে এমন একটা তথ্য, যার পর সুদৃঢ়তম বিশ্বাসের বনিয়াদও কেঁপে ওঠে। সামনে ছড়ানো কাগজপত্রে বিস্তর গণনার মধ্যে দিয়ে, আমি জানি, আমি এখন সেই সত্যেই উপনীত হতে পেরেছি।

নীহারিকায় পৌঁছোনোর আগে আমরা বলতে পারিনি কত বছর আগে ফেটে পড়েছিল সেখানকার সূর্য। কিন্তু এখন জ্যোর্তির্বিজ্ঞানের সাক্ষ্য প্রমাণ আর সেই পরিত্যক্ত গ্রহের পাথরের রেকর্ড থেকে আমি নির্ভুলভাবে হিসেব করে বার করে ফেলেছি। আমি জানি, কোন বছরে এই বিশাল অগ্ন্যুচ্ছাসের আলো পৌচেছিল আমাদের পৃথিবীতে। পেছনে ফেলে আসা সুপারনোভার মৃতদেহই যে একদিন কি পরিমাণ দীপ্তি ছড়িয়েছিল পৃথিবীর কালো আকাশে—আমি তা জানি। আমি জানি, পূর্বে সূর্য ওঠার আগে কি ভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল সে—প্রাচ্যের উষার পবিত্র সংকেতের মতই ছিল তার প্রাখর্য।

না, যুক্তিসংগত কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। পাওয়া গিয়েছে সুপ্রাচীন রহস্যের সমাধান। কিন্তু, ভগবান, আরও অনেক নক্ষত্রকেও তো তুমি কাজে লাগাতে পারতে? কি প্রয়োজন ছিল এতগুলি প্রাণীকে অগ্নিজঠরে নিক্ষেপ করে তাদের মৃত্যুর প্রতীককে বেথেলহোমের আকাশে প্রোজ্জ্বল করে রাখার?

যদি

১৯৬৬ সালের সতেরোই নভেম্বর ভোর রাতে এই কলকাতা শহর মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে যেত, পূর্ব-ভারত শ্মশান হয়ে যেত, যদি না প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র বর্ম-রহস্য ভেদ করতেন।

ব্যাপারটা এতদিন চেপেই রেখেছিলাম। প্রফেসর আতংক ছড়াতে চাননি। এখন আমাকে ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন। কেননা, এতদিন পর সেই জিনিসটা কলকাতার বুক থেকে তিনি সরিয়ে ফেলেছেন। জিনিসটা এখন সমুদ্রের তলায়।

১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম হপ্তায় প্রফেসর একটা চিঠি পেলেন। খামের ভেতর সাদা কাগজে শুধু একটা বর্ম আঁকা। হাতে আঁকা। তলায় লেখা :

'ওরে সবজান্তা প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র, দেখি তোকে এবার বাঁচায় কে! সামনের সতেরোই নভেম্বর ভোর রাতে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দেব তোকে, তোর ল্যাবোরেটরীকে, কলকাতা শহরকে। ভারতের পুবদিকটাও শ্মশান হয়ে যাবে—ঠিক কতটা যাবে এখনই আন্দাজ করতে পারছি না। ৩০ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমা খানকয়েক কলকাতায় ফেললে যা ঘটে, সেইরকম ঘটনাই ঘটবে। তোর বড় বাড় বেড়েছে। দেখি তোদের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররা তোকে বাঁচাতে পারে কিনা। আমি কে জানতে ইচ্ছে করছে? মরবার পর ভূত হয়ে এসে দেখে যাস।'

খাঁটি ইংরেজিতে ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে টাইপ করা আশ্চর্য এই চিঠি পেয়ে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র থ হয়ে গেলেন। আমাকে চিঠি দেখালেন। আমি হাতে আঁকা বর্মটা দেখিয়ে বললাম—"এটার মানে কী?"

প্রফেসর মাথা চুলকে বললেন—"সেইটাই তো ভাবছি।"

"চিঠিখানা কে লিখেছে বলে মনে হয়?"

"সেটাও তো ভাবছি।"

"কেউ কি ইয়ার্কি করেছে, না, সত্যি বলে মনে হয়?"

"ভাবছি, ভাবছি, তাও ভাবছি।"

"আচ্ছা মুস্কিল তো! সামান্য একখানা উড়ো চিঠি নিয়ে এত ভাববার কি আছে? ছিঁড়ে ফেলে দিন। সত্যি কিছু থাকলে এত ভাবনার দরকার হত না।"

"সেটাও ভাবছি।"

রাগ করে বাড়ী চলে এলাম আমি।

সেদিন রাতেই প্রফেসরের লেখাপড়া জানা শিম্পাঞ্জী রবি একটা চিঠি দিয়ে গেল আমাকে। প্রফেসর লিখেছেন:

'বর্ম কী দিয়ে তৈরী হয় জানো?'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল চিঠি পড়ে। বর্ম, মানে, আর্মার প্লেটে যে শতকরা নব্বই ভাগ লোহা আর দশভাগ নিকেল থাকে, তা পাঁচ বছরের বাচ্চাও জানে। ভাবেন কি প্রফেসর? এতই গোমুখ্যু আমি! পরের দিন ভোরবেলাই বাজার করার পথে গেলাম প্রফেসরকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিতে। কিন্তু তিনি নেই। গতকাল রাত্রে হাওয়া হয়ে গেছেন।

ঠিক একমাস পরে পনেরোই নভেম্বর সকালবেলা আমার বাড়ীতে একগাল হাসি নিয়ে হাজির হলেন প্রফেসর। ফোকলা মাড়ি দেখে দেখে গা-পিত্তি জ্বলে গেল আমার। কড়া গলায় বললাম—"যাওয়া হয়েছিল কোথায়?"

"ক্যালকাটাকে বাঁচাতে।"

"উড়ো চিঠির পেছনে এখনো উড়ে বেড়াচ্ছেন দেখছি।'

"উড়ো চিঠি নয় দীননাথ, কেস্ খুব সিরিয়াস। কাচুমাচুকে মনে আছে?"

"ডক্টর কাচুমাচু? জাপানের পাগল বৈজ্ঞানিক? আপনার নাম শুনলেই যিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।"

'এগজ্যাক্টলি!" মুখটা কাঁচুমাচু করেই বললেন প্রফেসর—"বুদ্ধির কমপিটিসনে হেরে গেছেন বলেই ক্ষেপে আছেন ভদ্রলোক, তাঁর কাছেই গেছিলাম।'

'কেন?'

প্রফেসর পাল্‌টা প্রশ্ন করলেন—'বর্ম কী দিয়ে তৈরী হয় জানা আছে তো?'

'প্রফেসর—'

উনি তাড়াতাড়ি বললেন—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি তাহলে জানো। কাচুমাচুর কাছে গেছিলাম সেই জন্যেই! ভেবেছিল আমার বুদ্ধি কম! তাই বর্ম দেখেও বুঝতে পারব না কলকাতাকে স্রেফ প্লেন করে দেওয়া হবে কি করে। নাইনটি পার্সেন্ট লোহা থাকে আমার প্লেটে। চাট্টিখানি কথা নাকি?'

'প্রফেসর—'

'সোজা চলে গেলাম জাপানে। সেখান থেকে জোগাড় করলাম ওর সিক্রেট ল্যাবোরেটরীর ঠিকানা! সাউথ প্যাসিফিকে তিনটে আগ্নেয় দ্বীপ আছে! সবচেয়ে বড়টার নাম মাসা তিয়েরা। স্প্যানিশনাম, আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক এই দ্বীপ থেকে 'রবিনসন ক্রুশো লেখবার প্রেরণা পান। কাচুমাচু পেয়েছেন আমাকে নিপাত করবার ফরমুলা।"

'প্রফেসর—'

'আরে শোনোই না। কথার মাঝে প্রফেসর, প্রফেসর করে বাগড়া দাও কেন!—গিয়ে শুনলাম কাচুমাচু মাস ছয়েক হল সেখান থেকেও ভেগেছেন। কিন্তু আমার নাম হল গিয়ে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র—

ঘাপ্‌টি মেরে আছেন কোথায় ঠিক বার করে ফেললাম। ছোট লঞ্চ নিয়ে একাই চলে গেলাম দূর সমুদ্রের একটা বিজন দ্বীপে।

কাচুমাচু সেখানে এলাহি কাণ্ড করে বসেছেন। ম্যাগনেটিক বীম বানিয়েছে।"

"ম্যাগনেটিক বীম!"

"ইয়েস, মাই বয়। উনি বৈজ্ঞানিক সভায় বলেছিলেন, এই পৃথিবীর ভেতরে কোথাও ন্যাচারাল ডায়নামো বসানো আছে। মেকানিক্যাল এনার্জিকে ম্যাগনেটিক এনার্জিতে রূপান্তর করছে। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের অ.সল কারণ সেইটাই। আমি প্রমাণ চেয়েছিলাম! সেই থেকেই উনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বিজন দ্বীপে গিয়ে দেখলাম পেল্লায় জেনারেটব বসিয়ে ইলেট্রিককে মেকানিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তর করে তা থেকে ম্যাগনেটিক বীম বানিয়ে নিচ্ছে।"

"ম্যাগনেটিক বীম মানেটা কী?"

"মানে? মানেটা কি করে বোঝাই বলো তো? ধরো, সমুদ্র দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। ম্যাগনেটিক বীম তার ওপর ফোকাস করা হল। সঙ্গে সঙ্গে লোহার জাহাজ চুম্বকের প্রচণ্ড টানে ছুটে এসে দ্বীপের পাথরে আছড়ে পড়বে। অথবা সাঁজোয়া বাহিনী শত্রুপক্ষের দিকে এগোচ্ছে। ম্যাগনেটিক বীম চালু করে দেওয়া হল, আর্মার্ড কার, ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক—সব চুম্বকের টানে ছুটে যাবে—নদী বা গিরিখাতে তলিয়ে যাবে—শত্রুর দিকে আর এগোতে হবে না। এমনিভাবে উড়ন্ত প্লেনের লোহার কলকব্জা খুলে নিচে চলে আসবে—প্লেন ভেঙে পড়বে। আমাদের এই লোহা সভ্যতা তছনছ করে ছাড়বে একা এই ম্যাগনেটিক বীম। ম্যাগনেটিক বীমের টান যে কি প্রচণ্ড, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। ব্রীজ ভেঙে দেয়, কংক্রিটের বাড়ী ধ্বসিয়ে দেয়, চলন্ত ট্রেন পাকসাট খেয়ে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়।"

'কিন্তু কলকাতা ধ্বংস হতে যাবে কেন?'

'আচ্ছা উজবুক তো, বললাম না আমার প্লেটে শতকরা নব্বই ভাগ লোহা থাকে!'

আমিও রেগে গিয়ে বললাম—'তার সঙ্গে কলকাতা ধ্বংসের কি সম্পর্ক।'

'ইডিয়ট, ইডিয়ট, একেবারে ফার্স্ট ক্লাশ ইডিয়ট! এখনো ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো না।' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে রেগে তিনটে হয়ে প্রফেসর বললেন—'নিজে ভাবো, ভেবে বার করো কেন খান কয়েক হাইড্রোজন বোমা ফাটার উপমা দিয়েছেন কাচুমাচু। আমি চললাম—দেখি ব্যুমেরাংয়ের খেলা।"

লাফিয়ে গিয়ে পথ আটকে ধরলাম প্রফেসরের—"ব্যুমেরাংয়ের খেলা ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যুমেরাংয়ের খেলা। সতেরোই নভেম্বর ভোর রাতে কাচুমাচুর বিজন দ্বীপ শূন্যে মিলিয়ে যাবে। কলকাতা বেঁচে যাবে। খি-খি-খি-খি!"

নিয়মিত যারা খবরের কাগজ পড়ে, তারা নিশ্চয় দেখে থাকবে খবরটা। সতেরোই নভেম্বর ভোর রাতে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অকস্মাৎ প্রলয় ঘটে গিয়েছিল। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা অনেক ভেবেও কুলকিনারা পাননি অতলান্ত সেই রহস্যের। আচমকা যেন কয়েকটা হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে কল্পনাতীত ধ্বংসলীলার মহড়া দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবীর মানুষ এরকম ভয়ংকর দৃশ্য কখনো দেখেনি। এ ঘটনা যদি ডাঙায় ঘটত, তাহলে যে কি ঘটত, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। শ্মশান হয়ে যেত গোটা একটা দেশ।

প্রফেসর খবরেরকাগজ খুলে হাঁ করে বসেছিলেন। আমি গিয়ে দেখলাম, চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। উনি আমাকে দেখলেন। কাগজ নামিয়ে রেখে ধরা গলায় বললেন, 'বিরাট একটা প্রতিভা শেষ হয়ে গেল, দীননাথ। সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল ম্যাগনেটিক বীম। ভালই হল। নইলে পৃথিবী শেষ করে ছাড়ত' কাচুমাচু।"

আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না যে এত কাণ্ডের মূলে রয়েছে ম্যাগনেটিক বীম নামক চুম্বকের খেলা।

প্রফেসর ফের বললেন—"বর্ম আঁকা দেখেই বুঝেছিলাম কি কাণ্ড করতেচ লেছেন কাচুমাচু।"

"কী কাণ্ড?"

"দীননাথ, একমাত্র ডিনামাইটে কত ক্যালোরি হীট বেরোয় জানো? একহাজার ক্যালোরি। কিন্তু যদি একটা পেল্লায় উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে আছড়ে পড়ে পৃথিবীতে, তখন যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড সংঘাতের ফলে, তা কল্পনাও করতে পারবে না। গ্রাম পিছু সাড়ে চার লক্ষ ক্যালোরি। এই কারণেই ক্যারোলিনায় সাতশ' বর্গকিলোমিটার জায়গা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে উল্কাপাতের ফলে। সাইবেরিয়ায় ১,৩০,০০০ কিলোমিটার বেগে দশলক্ষ টন ওজনের উল্কা ঠিকরে এসে পড়ায় সংঘাতের ধাক্কা টের পাওয়া গিয়েছিল আড়াই হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল পর্যন্ত—এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯০৮ সালে। বিশহাজার বছর আগে প্রায় বিশলক্ষ টন ওজনের একটা উল্কাপিণ্ড তিরিশ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমার মতই প্রলয় ঘটিয়েছিল আমেরিকার অ্যারিজোনা মরুভূমিতে। দেড় কিলোমিটার চওড়া গহ্বরটা আজও রয়েছে মরুভূমির বুকে। কিন্তু মানুষের কপাল ভাল, আজ পর্যন্ত জনবহুল কোনো অঞ্চলে এরকম উল্কাপাত ঘটেনি। কাচুমাচু উল্কাবৃষ্টি ঘটাতে চেয়েছিল কলকাতার বুকে ম্যাগনেটিক বীমের ক্ষমতা দেখানোর জন্যে।'

আমি বললাম—"ম্যাগনেটিক বীম দিয়ে উল্কাবৃষ্টি!"

প্রফেসর বিরক্ত হলেন—'মাথায় এত গোবর থাকলে তো কথা বলাই মুস্কিল! বার বার বলেছি বর্মে নিকেল আর লোহা থাকে, তবুও মাথায় ঢুকছে না। কাচুমাচুর ব্রেন আছে! বছরের এক একটা সময়ে উল্কাপাত ঘটবেই। চার্ট পর্যন্ত করে ফেলেছেন বৈজ্ঞানিকরা। এগুলো বাৎসরিক ব্যাপার। টেমপেল টাট্‌লু ধূমকেতুর ল্যাজ থেকে খসে পড়া লিওনিড্‌সু উল্কাবৃষ্টি ঘটে কিন্তু তেত্রিশ বছর অন্তর অন্তর—সাতাশে নভেম্বর থেকে চৌঠা ডিসেম্বরের মধ্যে। ১৯৬৬ সালের ১৭ই

নভেম্বরের ভোররাতে এই লিওনিডসের দেড় লাখ উল্কাপিণ্ডকে একসঙ্গে নিজের ল্যাবরেটরীর ওপরেই টেনে এনে ফেলেছিলেন কাচুমাচু।”

আমি আমতা আমতা করে বললাম—‘নিজের ওপরে উল্কাবৃষ্টি কেউ ঘটায় ?”

“তা ঘটায় না। কিন্তু কাচুমাচু বাধ্য হয়েছিলেন। যখন দেখলাম কলকাতা বুকে ম্যাগনেটিক বীমের মেশিন কোথায় বসিয়েছেন কিছুতেই তা বলছেন না—তখন ওঁকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে এলাম কলকাতার কোথায় মারাত্মক সেই মেশিন রয়েছে তখন জানতাম না, এই সেদিন জানলাম—মেশিনও বঙ্গোপসাগরে ফেলে এলাম।···দ্বীপে বসেই রিমোট কণ্ট্রোল করে ১৭ই নভেম্বর ভোর রাতে এই মেশিন চালু করে দিত কাচুমাচু। ঘরে আটকে রাখায় তা পারল না—কিন্তু ওর ল্যাবোরেটরীর ম্যাগনটিক বীম চালু করে দিয়ে এসেছিলাম বলে ১৭ই নভেম্বর আকাশের গোলাগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে চুম্বকের টানে নেমে এল ওর ওপরেই। সমুদ্রের জলে তলিয়ে গেল এ যুগের সবচেয়ে মারাত্মক হাতিয়ার।”

আমি আর থাকতে পারলাম না। মুখ-খিঁচুনি খাবো জেনেও কাঁচুমাচু মুখে বললাম—“কিন্তু আকাশের উল্কা চুম্বকের টানে নিচে নেমে এল কেন সেইটাই তো বুঝলাম না।”

“ইডিয়ট,” অনুকম্পার চোখে তাকিয়ে বললেন প্রফেসর—“উল্কার দেহও যে লোহা আর নিকেল দিয়ে তৈরী।”

“বর্ম দেখে বুঝলেন কি করে যে উল্কাবৃষ্টি ঘটাতে যাচ্ছেন কাচুমাচু ?’

‘আচ্ছা গবেট তো ! আরে বাবা, শতকরা নব্বই ভাগ লোহা আর দশ ভাগ নিকেল মিশিয়ে দারুণ মজবুত ইস্পাত বানিয়ে বর্ম তৈরীর মতলবটাই তো এসেছিল উল্কার উপাদান বিশ্লেষণ করার পর।’